ঘ রো য়া

ঘরোয়া

শ্রীরানী চন্দ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয়ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।

শান্তিনিকেতন
১৩ জুলাই ১৯৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত পুজোর ছুটিতে গুরুদেব যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অসুস্থ, আমরা অনেকেই সেখানে ছিলুম তাঁর সেবাশুশ্রূষার জন্য। আস্তে আস্তে গুরুদেবের অবস্থা যখন ভালোর দিকে যেতে লাগল সে সময়ে প্রায়ই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের নিয়ে নানা গল্পগুজব করে আসর জমাতেন। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গী যে না দেখেছে, ভাষা যে না শুনেছে, সে তা বুঝবে না; লিখে তা বোঝানো অসম্ভব। কথায় কি ভঙ্গীতে কোন্‌টাতে রস বেশি বিচার করা দায়। নানা প্রসঙ্গে নানা গল্পের ভিতর দিয়ে অনেক মূল্যবান কথা, ঘটনা শুনতুম। দুঃখ হত, লিখতে জানি নে; তবুও এ-সব অমূল্য কাহিনী কেউ জানবে না, নষ্ট হয়ে যাবে, এ সইত না— খাতার পাতায় অবসর-সময়ে লিখে রেখে দিতুম। আশা ছিল, একদিন একজন ভালো লিখিয়েকে দিয়ে এগুলো সবার সামনে ধরবার উপযোগী করা যাবে।

নভেম্বরের শেষে গুরুদেবকে নিয়ে দলবল শান্তিনিকেতনে ফিরে এল। আমাদের কয়েকজনের মধ্যে সময় ভাগ করা ছিল, যে যার সময়মত গুরুদেবের কাছে থাকি, তাঁর সেবা করি। মাস দুয়েক বাদে গুরুদেব অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন— তখন প্রায়ই তিনি দক্ষিণের বারান্দায় বসে কবিতা লিখতেন। আমাদের বেশি কিছু করবার থাকত না। কাছাকাছি বসে থাকতুম, সময়মত ওষুধ-পথ্য খাওয়াতুম। সে সময়ে গুরুদেব আমাকে বলতেন, 'রানী, তুই একটু লেখার অভ্যেস কর্‌-না। কিচ্ছু ভাবিস নে— বেশ তো, যা হয় একটা-কিছু লিখে আন্‌, আমি দেখিয়ে দেব। এই রকম দু-একবার লিখলেই দেখবি লেখাটা তোর কাছে বেশ সহজ হয়ে আসবে। চুপচাপ বসে থাকিস— আমার জন্য কত সময় তোদের নষ্ট হয়— আমার ভালো লাগে না।'

একদিন তাঁকে বললুম, 'নিজে লিখবার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না, ও আমার হবে না। তবে একটা ইচ্ছে আছে— এবারে অবনীন্দ্রনাথের কাছে গল্পচ্ছলে অনেক মূল্যবান কাহিনী ও কথা শুনেছি, যা আমার মনে হয় পাঁচজনের জানা দরকার, বিশেষ করে শিল্পীদের। সেই লেখাগুলো যদি দেখিয়ে দেন কী ভাবে লিখতে হবে, তবে তাই দিয়ে লেখা শুরু করতে পারি।'

গুরুদেব আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন; বললেন, 'তুই আজই আমাকে এনে দেখা কী লিখে রেখেছিস।'

দুপুরে আমার সেই লেখাগুলোই আর-একটু গুছিয়ে লিখে গুরুদেবের কাছে গেলুম। দুপুরের বিশ্রামের পর কৌচে উঠে বসেছেন ; বললেন, 'কই, এনেছিস? দেখি।' লেখাগুলো হাতে দিলুম, তিনি আগাগোড়া এক নিশ্বাসে পড়লেন। বললেন, 'এ অতি সুন্দর হয়েছে। অবন কথা কইছে, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি। কথার একটানা স্রোত বয়ে চলেছে— এতে হাত দেবার জায়গা নেই, যেমন আছে তেমনিই থাক্।'

পরে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী 'প্রবাসী'তে সেটি ছাপা হয়।

গুরুদেব খুব খুশি। আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'অবন বসে লিখবার ছেলে নয়, আর কোমর বেঁধে লিখলে এমন সহজ বাণী পাওয়া যাবে না। তুই যত পারিস ওর কাছ থেকে আদায় করে নে।'

জুনের শেষ দিকে একবার গুরুদেব আমাকে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় পাঠান গল্প সংগ্রহ করার কাজে। সে সময়ে গুরুদেবের গল্প বা কবিতা লেখার কাজ আমরা যারা কাছাকাছি থাকতুম, আমরাই করতুম। আঙুলে কী রকম একটা ব্যথা হয়, উনি লিখতে পারতেন না, কষ্ট হত। মুখে মুখে বলে যেতেন, আমরা লিখে নিতুম। তাই সে সময়ে কলকাতায় যাবার আমার ইচ্ছা ছিল না। অথচ গুরুদেব গল্প শুনতে চাইছেন— সেও একটা কাজ। কী করি। গুরুদেব বললেন, 'তুই ভাবিস নে, তোর জায়গা কেউ নিতে পারবে না— এই মুখ বন্ধ করলুম, আর মুখ খুলব তুই ফিরে এলে।' বলে হেসে মুখে আঙুল চাপা দিলেন।

কলকাতায় এলুম— জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই থাকি। অবনীন্দ্রনাথও খুব খুশি, রবিকাকা গল্প শুনতে চেয়েছেন, দু-বেলা এ বাড়িতে এসে গল্প বলে যান। সে কী আগ্রহ তাঁর। বললেন, 'যত পার নিয়ে নাও ; সময় আমারও বড়ো কম। কে জানত রবিকাকা আমার এই-সব গল্প শুনে এত খুশি হবেন।' বলতে বলতে তাঁর চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠত।

বেশি দিন গুরুদেবকে ছেড়ে থাকতে মন কেমন করছিল। দিন সাতেকে অনেকগুলো গল্প সংগ্রহ করে ফিরে এলুম শান্তিনিকেতনে। আসবার সময় অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'যাও এবারকার মতো এই গল্পগুলো নিয়েই। গিয়ে শোনাও রবিকাকাকে। ওঁর অসুস্থ শরীরে বেশি উৎসাহ আনন্দ দিতেও ভয় হয়— এই বুঝে লেখা ওঁকে শুনিয়ো। এই গল্পগুলো শুনে রোগশয্যায় যদি

উনি মুহূর্তের জন্যও খুশি হন, সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

ফিরে এসে যখন গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেলুম, প্রথমেই হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এবারে কী এনেছিস দেখি।' সবগুলো লেখা একসঙ্গে দিলুম না, স্বদেশী যুগের গল্পটি দিলুম। তখনি পড়লেন— পড়বার সময়ে দেখেছি তাঁর মুখ-চোখের ভাব, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মনে হচ্ছিল পড়তে পড়তে সে যুগে চলে গেছেন। সে-সময়কার নিজেকে যেন স্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন। কখনো বললেন 'অবন এতও মনে রেখেছে কী করে।' কখনো-বা সহিসদের রাখী পরানোর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে হো হো করে হেসে উঠেছেন —'কী কাণ্ড সব করেছি তখন।' কখনো-বা মুখ গম্ভীর হয়ে উঠত; বলতেন 'ঠিকই বলেছে অবন, আমার মতের সঙ্গে ওদের মিলত না— আমার মত ছিল ও বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।'

সেদিনের মতো সেই গল্পটি ওঁকে পড়তে দিয়ে অন্যগুলি ওঁর পাশে রেখে দিলুম— রোজ একটি দুটি করে পড়তেন। কী খুশি যে হয়েছিলেন সে যুগের কর্মী রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়ে। কয়দিন অবধি দেখতুম যেন সেই-সব স্বপ্নেই মগ্ন হয়ে আছেন। সবার সঙ্গে সেই-সব গল্পই করতেন। বলতেন, 'এক-একটা যুগের এক-একটা মনোবৃত্তি ধরা পড়ে। তখন সেই স্বদেশী যুগে চার দিকে কী একটা উন্মত্ততা, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন। পি. এন. বোস বলতেন রবিবাবু, এ যে হল, হয়ে গেল। অর্থাৎ দেশ-উদ্ধার হয়ে গেল। আমি বলতুম, হল বৈকি। 'তার পর গেল সেই যুগ, গেল সেই উন্মত্ততা। সিরিয়াস হয়ে গেলুম। এখানে চলে এলুম; খোড়ো ঘর, গহনাপত্র নেই, গরিবের মতো বাস করতে লাগলুম।

'কী সুন্দর অবন সেকালের-আমাকে তুলে ধরেছে। আমি কী ছিলুম। সবাই ভাবে আমি চিরকাল বাবুয়ানি করেই কাটিয়েছি, পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে। কিন্তু কিসের ভিতর দিয়ে যে আমাকে আসতে হয়েছে, এ লেখাগুলোতে তা স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। এটা তুই একটা খুব বড়ো কাজ করেছিস। আমার এত ভালো লাগছে, সব যেন চোখের উপরে ভাসছে। অবনরা সবাই আমার সঙ্গে কাজ করেছে— ভয়ে কেউ পিছিয়ে যায় নি। ওদের মধ্যে গগন ছিল খুব সাহসী।

'আমি কখনো কারো স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করতে চাই নি। আমি

বলতুম, বিলিতি জিনিস যে চায় কিনুক, আমাদের উদ্দেশ্য তাদের বুঝিয়ে দেওয়া। দেখতুম তো তখন দেশী সুতোয় কাপড় ভালো হত না। আমিও করিয়েছিলুম কাপড়, দেশী সুতো আনিয়ে। তা, কেউ যদি বিলিতি কাপড় পরতে চায় বাধা দেব কেন। আমাদের কাজ ছিল লোকের স্বাধীনতায় বাধা না দিয়ে দেশের ভালোমন্দ অবস্থা বুঝিয়ে দেওয়া, লোকের প্রাণে সেটি ঢুকিয়ে দেওয়া। তাই, যখন বিপিন পালরা বিলিতি জিনিস বয়কট করতে বললেন, আমি স্পষ্টই বললুম আমি এতে নেই।

'কী কাজ করতুম তখন, পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। রাত একটার সময়ে হয়তো বিপিন পাল এসে উপস্থিত— অমুক জায়গায় পুলিস অত্যাচার করছে। সুরেনদের পাঠিয়ে দিতুম। আমার ওই আর একটি ছিল সুরেন, সে তো চলে গেল। ওকে আমিই মানুষ করেছিলুম, নির্ভয় করেছিলুম। বেপরোয়া হয়ে চলতে শিখেছিল।

'তখন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কী নিঃশঙ্ক বেপরোয়া ভাবে কাজ করেছি। যা মাথায় ঢুকেছে করে গেছি— কোনো ভয়-ডর ছিল না। আশ্চর্য রূপ দিয়েছে, ছবির পর ছবি ফুটিয়ে গেছে অবন। সে একটা যুগ, আর তাদের রবিকাকা তার মধ্যে ভাসমান। আজ অবনের গল্পে সে কালটা যেন সজীব প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। আবার সে যুগে ফিরে গিয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। ওইখানেই পরিপূর্ণ আমি। পরিপূর্ণ আমাকে লোকেরা চেনে না— তারা আমাকে নানা দিক থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে। তখন বেঁচে ছিলুম— আর এখন আধমরা হয়ে ঘাটে এসে পৌঁচেছি।'

কখনো-বা তাঁর মা'র গল্প পড়তে পড়তে বলতেন, 'মাকে আমরা জানি নি, তাঁকে পাই নি কখনো। তিনি থাকতেন তাঁর ঘরে তক্তাপোশে বসে, খুড়ির সঙ্গে তাস খেলতেন। আমরা যদি দৈবাৎ গিয়ে পড়তুম সেখানে, চাকররা তাড়াতাড়ি আমাদের সরিয়ে আনত— যেন আমরা একটা উৎপাত। মা যে কী জিনিস তা জানলুম কই আর। তাই তো তিনি আমার সাহিত্যে স্থান পেলেন না। আমার বড়দিদিই আমাকে মানুষ করেছেন। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। মার ঝোঁক ছিল জ্যোতিদা আর বড়দার উপরেই। আমি তো তাঁর কালো ছেলে। বড়দির কাছে কিন্তু সেই কালো ছেলেই ছিল সব চেয়ে ভালো। তিনি বলতেন, যা'ই বলো, রবির মতো কেউ না।

বড়দিদির হাত থেকে আমাকে হাতে নিলেন নতুন-বউঠান।' এই বলতে বলতে গুরুদেবের চোখ সজল হয়ে আসত।

সেবারে যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিলুম, আর দু-বেলা গল্প শুনতুম, তখন রোজই অবনীন্দ্রনাথ ভোর ছটায় এ বাড়িতে চলে আসতেন। দশটা সাড়ে-দশটা অবধি নানারকম গল্পগুজব হত। একদিন সকালে ওঁর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ভাবলুম বুঝি-বা শরীর খারাপ হয়েছে। ও বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি বাগানের এক কোণে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'না, ও আর পাওয়া যাবে না, একেবারে গর্তে পালিয়েছে।' আমার একটু অবাক লাগল; বললুম, 'কী খুঁজছেন আপনি।' তিনি বললেন, 'একটা ইঁদুর, জ্যান্ত হয়ে আমার হাত থেকে লাফিয়ে কোথায় যে পালালো! ও ঠিক গর্তে ঢুকে বসে আছে। কাল বিকেলে একটা ইঁদুর করলুম, কাঠের, এই এতটুকু, বেড়ে ইঁদুরটি হয়েছিল, কেবল লেজটুকু জুড়ে দেওয়া বাকি। ভাবলুম এটা শেষ করেই আজ উঠব। সন্ধে হয়ে এসেছে, ভালো দেখতে পাচ্ছিলুম না— চৌকিটা বারান্দার রেলিঙের পাশে টেনে নিয়ে ওই যেটুকু আলো পাচ্ছি তাইতেই কোনোরকমে তারের একটি লেজ যেই না ইঁদুরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটু মোচড় দিয়েছি— টক্ করে হাত থেকে লেজ-সমেত ইঁদুরটি লাফিয়ে পড়ল। কোথায় গেল, এ দিকে খুঁজি, ও দিকে খুঁজি। রাদশাকে বললুম, আলোটা আন্ তো, একটু খুঁজে দেখি কোথায় পালালো। না, সে কোথাও নেই। রাত্রে ভালো ঘুম হল না— ভোর হতে না হতেই উঠে পড়লুম; ভাবলুম, যদি নীচে বাগানে পড়ে গিয়ে থাকে। দেখি সেখানে যত পোড়া বিড়ি আর দেশলাইয়ের কাঠি ছড়ানো। চাকররা খেয়ে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমার ইঁদুরের আর সন্ধান মিলল না। ও জ্যান্ত হয়ে একেবারে গর্তে ঢুকে বসে মজা দেখছে। কী আর করা যাবে, চলো যাই, এবারে তা হলে আমাদের গল্প শুরু করি গিয়ে।'

কিন্তু ওই অতটুকু তারের লেজের কাঠের ইঁদুর ওঁকে তিনদিন সমানে বাগানের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়েছে। উপরে উঠতে নামতে একবার করে খানিকক্ষণ দোতলার বারান্দার ঠিক নীচের বাগানের খানিকটা জায়গা ঘুরে ঘুরে খুঁজতেন; বলতেন, 'দাঁড়া, একবার ঘুরে দেখে যাই, যদি মিলে যায়।'

এই গল্পটি যখন গুরুদেবকে বললুম, গুরুদেবের সে কী হো হো করে হাসি—

বললেন, 'অবন চিরকালের পাগলা।'

সে হাসিতে স্নেহ যেন শতধারায় ঝরে পড়ল।

গুরুদেব বলতেন, 'অবনের খেলনাগুলো দু-তিনজন করে না দেখিয়ে একটা পাবলিক এক্‌জিবিশন করতে বলিস। খুব ভালো হবে। সবাই দেখুক, অনেক কিছু শিখবার আছে। লোকের সৃষ্টিশক্তির ধারা কত প্রকারে প্রবাহিত হয় দেখ্। ছবি আঁকত, তার পরে এটা থেকে ওটা থেকে এখন খেলনা করতে শুরু করেছে, তবুও থামতে পারছে না— আমার লেখার মতো। না, সত্যিই অবনের সৃজনী শক্তি অদ্ভুত। তবে ওর চেয়ে আমার একটা জায়গায় শ্রেষ্ঠতা বেশি, তা হচ্ছে আমার গান। অবন আর যাই করুক, গান গাইতে পারে না। সেখানে ওকে হার মানতেই হবে।' এই বলে হাসতে লাগলেন।

গুরুদেব নিজে এই লেখাগুলো বই আকারে বের করবার জন্য ছাপতে দিলেন। তাতে আরো কিছু গল্পের প্রয়োজন হয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আবার কিছুদিনের জন্য কলকাতায় আসি। আসবার সময় গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেছি— তখন অপারেশন হবে কথাবার্তা চলছে ; গুরুদেব কৌচে বসে ছিলেন, কেমন যেন বিষণ্নভাব। প্রণাম করে উঠতে তিনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ধীরে ধীরে বললেন, 'অবনকে গিয়ে বলিস, আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার জীবনের সব বিলুপ্ত ঘটনা যে অবনের মুখ থেকে এমন করে ফুটে উঠবে, এমন স্পষ্ট রূপ নেবে, তা কখনো মনে করি নি। অবনের মুখ থেকে আজ দেশের লোক জানুক তার রবিকাকাকে।'

অবনীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের জন্মদিনে দেশের লোক চুপ করে থাকবে এটা গুরুদেবকে বড়োই বিচলিত করেছিল। তিনি আশে-পাশের সবাইকে সেটা বলতেন। ১২ই জুলাইও তিনি বলেছেন, 'আমি অবনের জন্য চিন্তা করছি। এটা অবজ্ঞা করে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। সময় নেই, একটা-কিছু বিশেষ ভাবে করা দরকার।' এবারে কলকাতায় এসেও তিনি সবাইকে বলেছেন, 'অবন কিছু চায় না, জীবনে চায় নি কিছু। কিন্তু এই একটা লোক যে শিল্প-জগতে যুগপ্রবর্তন করেছে, দেশের সব রুচি বদলে দিয়েছে! সমস্ত দেশ যখন নিরুদ্ধ ছিল, এই অবন তার হাওয়া বদলে দিলে। তাই বলছি, আজকের দিনে এঁকে যদি বাদ দাও তবে সবই বৃথা।'

অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিনে উৎসব করা নিয়ে তাঁর নিজের ঘোরতর আপত্তি।

এ বিষয়ে কেউ তাঁর কাছে কিছু বলতে গেলে তাড়া খেয়ে ফিরে আসেন। সেবারে যখন কলকাতায় আসি গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, 'তুই নাহয় আমার নাম করেই অবনকে বলিস।' কিন্তু আমারও কেমন ভয়-ভয় করল। কারণ, একদিন দেখলুম, নন্দদা এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথকে বলতে এসে একবার বলবার জন্য এগিয়ে যান, আবার সরে আসেন, এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও কিছু বলতে পারলেন না— অবনীন্দ্রনাথ একমনে পুতুলই গড়ে চললেন, তাঁর ও দিকে খেয়ালই নেই। তাই এবারে যখন গুরুদেব কলকাতায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'অবনের জন্মোৎসবের কতদূর কী এগোল', সুযোগ বুঝে নালিশ করলুম। গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথকে খুব ধমকে দিলেন, মা যেমন দুষ্টু ছেলেকে দেয়। বললেন, 'অবন, তোমার এতে আপত্তির মানে কী। দেশের লোক যদি চায় কিছু করতে তোমার তো তাতে হাত নেই।' অবনীন্দ্রনাথ আর কী করেন, ছোটো ছেলে বকুনি খেলে তার যেমন মুখখানি হয়, অবনীন্দ্রনাথের তেমনি মুখের ভাবখানা হয়ে গেল। বললেন, 'তা আদেশ যখন করেছ, মালাচন্দন পরব, ফোঁটানাটা কাটব, তবে কোথাও যেতে পারব না কিন্তু।' এই বলেই তিনি গুরুদেবকে প্রণাম করে পড়ি কি মরি সেই ঘর থেকে পালালেন। গুরুদেব হেসে উঠলেন ; বললেন, 'পাগলা বেগতিক দেখে পালালো।'

আশি বছরের খুড়ো সত্তর বছরের ভাইপোকে যে 'পাগলা' বলে হেসে উঠলেন, এ জিনিস বর্ণনা করে বোঝাবে কে।

এই গল্পগুলো গুরুদেবের কাছে এত মান পাবে তা অবনীন্দ্রনাথও ভাবেন নি কখনো। গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী বই ছাপা শেষ হয়ে এল, কিন্তু কয়টা দিনের জন্য তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলুম না। আজ এ বই হাতে নিয়ে তাঁকে বার বার প্রণাম করছি, আর প্রণাম করছি অবনীন্দ্রনাথকে, যিনি গল্পচ্ছলে আমার ভিতর এই রসের ধারা বইয়ে দিলেন।

জন্মাষ্টমী
১৩৪৮

শ্রীরানী চন্দ

আমার প্রায়ই মনে পড়ে, সে অনেক দিনের কথা, রবিকাকার অনেক কাল আগেকার একটা ছড়া। তখন নীচে ছিল কাছারিঘর, সেখানে ছিল এক কর্মচারী, মহানন্দ নাম, সাদা চুল, সাদা লম্বা দাড়ি। তারই নামে তার সব বর্ণনা দিয়ে মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন, সোমকা প্রায়ই সেটা আওড়াতেন—

মহানন্দ নামে এ কাছারিধামে
আছেন এক কর্মচারী,
ধরিয়া লেখনী লেখেন পত্রখানি
সদা ঘাড় হেঁট করি।

আরো সব নানা বর্ণনা ছিল— মনে আসছে না, সেই খাতাটা খুঁজে পেলে বেশ হত। কী সব মজার কথা ছিল সেই ছড়াটিতে—

হস্তেতে ব্যজনী ন্যস্ত,
মশা মাছি ব্যতিব্যস্ত—
তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস—

ভুলে গেছি কথাগুলো। মহানন্দ দিনরাত পিঠের কাছে এক গির্দা নিয়ে খাতাপত্রে হিসাবনিকেশ লিখতেন, আর এক হাতে একটা তালপাতার পাখা নিয়ে অনবরত হাওয়া করতেন। রবিকাকাকে বোলো এই ছড়াটির কথা, বেশ মজা লাগবে, হয়তো তাঁর মনেও পড়বে।

দেখো, শিল্প জিনিসটা কী, তা বুঝিয়ে বলা বড়ো শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে— যা'ই বলো।

একালে যেন শখ নেই, শখ বলে কোনো পদার্থই নেই। এ-কালে সব-কিছুকেই বলে 'শিক্ষা'। সব জিনিসের সঙ্গে শিক্ষা জুড়ে

দিয়েছে। ছেলেদের জন্য গল্প লিখবে তাতেও থাকবে শিক্ষার গন্ধ। আমাদের কালে ছিল ছেলেবুড়োর শখ বলে একটা জিনিস, সবাই ছিল শৌখিন সে কালে, মেয়েরা পর্যন্ত— তাদেরও শখ ছিল। এই শৌখিনতার গল্প আছে অনেক, হবে আর-এক দিন। কত রকমের শখ ছিল এ বাড়িতেই, খানিক দেখেছি, খানিক শুনেছি। যাঁরা গল্প বলেছেন তাঁরা গল্প বলার মধ্যে যেন সেকালটাকে জীবন্ত করে এনে সামনে ধরতেন। এখন গল্প কেউ বলে না, বলতে জানেই না। এখনকার লোকেরা লেখে ইতিহাস। শখের আবার ঠিক রাস্তা বা ভুল রাস্তা কী। এর কি আর নিয়মকানুন আছে। এ হচ্ছে ভিতরকার জিনিস, আপনিই সে বেরিয়ে আসে, পথ করে নেয়। তার জন্য ভাবতে হয় না। যার ভিতরে শখ নেই, তাকে এ কথা বুঝিয়ে বলা যায় না।

ছবিও তাই— টেকনিক, স্টাইল, ও-সব কিছু নয়, আসল হচ্ছে এই ভিতরের শখ। আমার বাজনার বেলায়ও হয়েছিল তাই। শোনো তবে, তোমায় বলি গল্পটা গোড়া থেকে।

ইচ্ছে হল পাকা বাজিয়ে হব, যাকে বলে ওস্তাদ। এসরাজ বাজাতে শুরু করলুম ওস্তাদ কানাইলাল ঢেরীর কাছে, আমি সুরেন ও অরুদা। শিমলের ও দিকে বাসাবাড়ি নিয়ে ছিল, আমরা রোজ যেতুম সেখানে বাজনা শিখতে। সুরেনের বিলিতি মিউজিক পিয়োনো সব জানা ছিল, ভালো করে শিখেছিল, সে তো তিন টপকায় মেরে দিলে। অরুদাও কিছুকালের মধ্যে কায়দাগুলো কস্ত করে নিলেন। আমার আর, যাকে বলে এসরাজের টিপ, সে টিপ আর দোরস্ত হয় না। আঙুলে কড়া পড়ে গেল, তার টেনে ধরে ধরে। বারে বারে চেষ্টা করছি টিপ দিতে, তার টেনে ধরে কান পেতে আছি কতক্ষণে ঠিক যে-সুরটি দরকার সেইটি বেরিয়ে আসবে, হঠাৎ এক সময়ে অ্যাঁ—ও করে শব্দ বেরিয়ে এল। ওস্তাদ হেসে বলত, হাঁ, এইবারে হল। আবার ঠিক না হলে মাঝে মাঝে ছড়ের

বাড়ি পড়ত আমার আঙুলে। প্রথম প্রথম আমি তো চমকে উঠতুম, এ কী রে বাবা। এমনি করে আমার এসরাজ শেখা চলছে, রীতিমত হাতে নাড়া বেঁধে। ওস্তাদও পুরোদমে গুরুগিরি ফলাচ্ছে আমার উপরে। দেখতে দেখতে বেশ হাত খুলে গেল, বেশ সুর ধরতে পারি এখন, যা বলে ওস্তাদ তাই বাজাতে পারি, টিপও এখন ঠিকই হয়। ওস্তাদ তো ভারি খুশি আমার উপর। তার উপর বড়োলোকের ছেলে, মাঝে মাঝে পেন্নামি দেই, একটু ভক্তিটক্তি দেখাই— এমন শাগরেদের উপর নজর তো একটু থাকবেই। এই পেন্নামি দেবার দস্তুরমত একটা উৎসবের দিনও ছিল। শ্রীপঞ্চমীর দিন একটা বড়ো রকমের জলসা হত ওস্তাদের বাড়িতে। তাতে তার ছাত্ররা সবাই জড়ো হত, বাইরের অনেক ওস্তাদ শিল্পীরাও আসতেন। সেদিন ছাত্রদের ওস্তাদকে পেন্নামি দিয়ে পেন্নাম করতে হত। আমিও যাবার সময় পকেটে টাকাকড়ি নিয়ে যেতুম। অরুদা সুরেন ওরা এ-সব মানত না।

এসরাজ বাজাতে একেবারে পাকা হয়ে গেলুম। চমৎকার টিপ দিতে পারি এখন। শখ আমাকে এই পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। আমরা যখন ছোটো ছিলুম মহর্ষিদেব আমাদের কাছে গল্প করেছেন— একবার তাঁরও গান শেখবার শখ হয়েছিল। বিডন স্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া করে ওস্তাদ রেখে কালোয়াতি গান শিখতেন, গলা সাধতেন। কিন্তু তাঁর গলা তো আমরা শুনেছি— সে আর-এক রকমের ছিল, যেন মন্ত্র আওড়াবার গলা, গানের গলা তাঁর ছিল বলে বোধ হয় না।

যে কথা বলছিলুম। দেখি সেই মামুলি গৎ, সেই মামুলি সুর বাজাতে হবে বারে বারে। একটু এদিক-ওদিক যাবার জো নেই— গেলেই তো মুশকিল। কারণ, ওই-যে বললুম, ভিতরের থেকে শখ আসা চাই। আমার তা ছিল না, নতুন সুর বাজাতে পারতুম না, তৈরি করবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ বারে বারে

ধরাবাঁধা একই জিনিসে মন ভরে না। সেই ফাঁকটা নেই যা দিয়ে গলে যেতে পারি, কিছু সৃষ্টি করে আনন্দ পেতে পারি। হবে কী করে— আমার ভিতরে নেই, তাই ভিতর থেকে এল না সে জিনিস। ভাবলুম কী হবে ওস্তাদ হয়ে, কালোয়াতি সুর বাজিয়ে। আমার চেয়ে আরো বড়ো ওস্তাদ আছেন সব— যাঁরা আমার চেয়ে ভালো কালোয়াতি সুর বাজাতে পারেন। কিন্তু ছবির বেলা আমার তা হয় নি। বড়ো ওস্তাদ হয়ে গেছি এ কথা ভাবি নি— আমিও তাদের সঙ্গে পাল্লা দেব, ছবির বেলায় হয়েছিল আমার এই শখ। ছবির বেলায় এই শখ নিয়ে আমি পিছিয়ে যাই নি কখনো। বড়োজ্যাঠামশায় একবার আমার ছবি দেখে বললেন, হ্যাঁ, হচ্ছে ভালো, বেশ, তবে গোটাকতক মাস্টারপিস প্রডিউস করো। তা নইলে কী হল। এই-সব লোকের কাছ থেকে আমি এইরকম সার্টিফিকেট পেয়েছি। এখন বুঝি 'মাস্টার' হতে হলে কতটা সাধনার দরকার। এখনো সেরকম মাস্টারপিস প্রডিউস করবার মতো উপযুক্ত হয়েছি কিনা আমি নিজেই জানি নে। বাজনাটা একেবারে ছেড়ে দিলুম না অবিশ্যি— কিন্তু উৎসাহও আর তেমন রইল না। বাড়িতে অনেকদিন অবধি সংগীতচর্চা করেছি। রাধিকা গোঁসাই নিয়মমত আসত। শ্যামসুন্দরও এসে যোগ দিলে। শ্যামসুন্দর ছিল কর্তাদের আমলের। মা বললেন, আবার ও কেন, তোমাদের মদ-টদ খাওয়ানো শেখাবে। ওকে তোমরা বাদ দাও। আমি বললুম, না মা, ও থাক্‌, গানবাজনা করবে। মদ খাব আমরা সে ভয় কোরো না। শ্যামসুন্দরও থেকে গেল। রোজ জলসা হত বাড়িতে। রবিকাকা গান করতেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে বসে তাঁর গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এসরাজ বাজাতুম। ওইটাই আমার হত, কারো গানের সঙ্গে যে-কোনো সুর হোক-না কেন, সহজেই বাজিয়ে যেতে পারতুম। তখন 'খামখেয়ালি' হচ্ছে। একখানা ছোট্ট বই ছিল, লালরঙের মলাট, গানের ছোটো সংস্করণ, বেশ পকেটে করে নেওয়া

যায়— দাদা সেটিকে যত্ন করে বাঁধিয়েছিলেন প্রত্যেক পাতাতে একখানা করে সাদা পাতা জুড়ে, রবিকাকা গান লিখবেন বলে— কোথায় যে গেল সেই খাতাখানা, তাতে অনেক গান তখনকার দিনের লেখা পাওয়া যেত। এ দিকে রবিকাকা গান লিখছেন নতুন নতুন, তাতে তখুনি সুর বসাচ্ছেন, আর আমি এসরাজে সুর ধরছি। দিনুরা তখন সব ছোটো— গানে নতুন সুর দিলে আমারই ডাক পড়ত। একদিন হয়েছে কী, একটা নতুন গান লিখেছেন, তাতে তখনি সুর দিয়েছেন— আমি যেমন সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে যাই, বাজিয়ে গেছি। সুর-টুর মনে রাখতে হবে, ও-সব আমার আসে না, তা ছাড়া তা খেয়ালই হয় নি তখন। পরের দিনে যখন আমায় সেই গানের সুরটি বাজাতে বললেন, আমি তো একেবারে ভুলে বসে আছি— ভৈরবী, কি, কী রাগিণী, কিছুই মনে আসছে না, মহা বিপদ। আমার ভিতরে তো সুর নেই, সুর মনে করে রাখব কী করে। কান তৈরি হয়েছে, হাত পেকেছে, যা শুনি সঙ্গে সঙ্গে বাজনায় ধরতে পারি, এই যা। এ দিকে রবিকাকাও গানে সুর বসিয়ে দিয়েই পরে ভুলে যান। অন্য কেউ সুরটি মনে ধরে রাখে। রবিকাকাকে বললুম, কী যেন সুরটি ছিল একটু একটু মনে আসছে। রবিকাকা বললেন, বেশ করেছ, তুমিও ভুলেছ আমিও ভুলেছি। আবার আমাকে নতুন করে খাটাবে দেখছি। তার পর থেকে বাজনাতে সুর ধরে রাখতে অভ্যেস করে নিয়েছিলুম, আর ভুলে যেতুম না। কিন্তু ওই একটি সুর রবিকাকার আমি হারিয়েছি— কেউ আর পেলে না কোনোদিন, তিনিও পেলেন না।

গানটা আর আমার হল না। এই সেদিন কিছুকাল আগেই আমি রবিকাকাকে বললুম, দেখো, আমি তো তোমার গান গাইতে পারি না, তোমার সুর আমার গলায় আসে না, কিন্তু আমার সুরে যদি তোমার গান গাই, তোমার তাতে আপত্তি আছে? যেমন অ্যাকৃটিং— উনি কথা দেন, আমি অ্যাকৃটিং করি। তাই ভাবলুম,

কথা যদি ওঁর থাকে আর আমার সুরে আমি গাই তাতে ক্ষতি কী। রবিকাকা বললেন, না, তা আর আপত্তি কী। তবে দেখো গানগুলো আমি লিখেছিলেম, সুরগুলোও দিয়েছি, সেগুলির উপর আমার মমতা আছে, তা নেহাত গাওই যদি তবে তার উপর একটু মায়াদয়া রেখে গেয়ো।

সে সময়ে রবিকাকার গানের সঙ্গে আমাদের বাজনা ইত্যাদি খুব জমত। এই একতলার বড়ো ঘরটিতেই আমাদের জলসা হত রোজ। ঘণ্টার জ্ঞান থাকত না, এক-একদিন প্রায় সারারাত কেটে যেত। আমি এসরাজ বাজাতুম, নাটোর বাজাতেন পাখোয়াজ। ওই সময়ে একটা ড্রামাটিক ক্লাব হয়েছিল, তাতে রবিকাকা আমরা অনেকগুলি প্লে করেছিলুম। সে-সব পরে এক সময় বলব। তবে 'বিসর্জন' নাটক লেখার ইতিহাসটা বলি শোনো। তখন বর্ষাকাল, রবিকাকা আছেন পরগনায়। দাদা অরুদা আমরা কয়জনে, একটা কী নাটক হয়ে গেছে, আর-একটা নাটক করব তার আয়োজন করছি। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'এর বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে কেবল কথাটুকু নিয়ে খাড়া করে তুলেছি নাটক করব। ঝুপ্‌ঝুপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে, আমরা সব তাকিয়া বুকে নিয়ে এই-সব ঠিক করছি— এমন সময় রবিকাকা কী একটা কাজে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, দেখি কী হচ্ছে! খাতাটা নিয়ে নিলেন, দেখে বললেন, না, এ চলবে না— আমি নিয়ে যাচ্ছি খাতাটা, শিলাইদহে বসে লিখে আনব, তোমরা এখন আর-কিছু কোরো না। যাক, আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। এর কিছুদিন বাদেই রবিকাকা শিলাইদহে গেলেন, আট-দশ দিন বাদে ফিরে এলেন, 'বিসর্জন' নাটক তৈরি। এই রথীর ঘরেই প্রথম নাটকটি পড়া হল, আমরা সব জড়ো হলুম— তখনই সব ঠিক হল, কে কী পার্ট নেবে, রবিকাকা কী সাজবেন। হ. চ. হ.র উপর ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার, সীন আঁকবার। আমিও তার সঙ্গে লেগে গেলুম। এক সাহেব পেন্টার জোগাড় করে আনা গেল, সে ভালো সীন আঁকতে পারত,

ইলোরা কেভ থেকে থাম-টাম নিয়ে কালীমন্দির হল। মোগল পেন্টিং থেকে রাজসভা হল। কোনো কারণে ড্রামাটিক ক্লাব উঠে গেল, পরে শুনবে। তবে অনেক চাঁদার টাকা জমা রেখে গেল। এখন এই টাকাগুলো নিয়ে কী করা যাবে পরামর্শ হচ্ছে। আমি বললুম, কী আর হবে, ড্রামাটিক ক্লাবের শ্রাদ্ধ করা যাক— এই টাকা দিয়ে একটা ভোজ লাগাও। ধূমধামে ড্রামাটিক ক্লাবের শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করা গেল— এ হচ্ছে 'খামখেয়ালি'র অনেক আগে। ড্রামাটিক ক্লাবের শ্রাদ্ধে রীতিমত ভোজের ব্যবস্থা হল, হোটেলের খানা। 'বিনি পয়সার ভোজ'এর মধ্যে আমাদের সেইদিনটার মনের ভাব কিছু ধরা পড়েছে। এই শ্রাদ্ধবাসরে দ্বিজুবাবু নতুন গান রচনা করে আনলেন 'আমরা তিনটি ইয়ার' এবং 'নতুন কিছু করো'। দ্বিজুবাবু আমাদের দলে সেই দিন থেকে ভরতি হলেন। এই শ্রাদ্ধের ভোজে 'নিয়াপোলিটান ক্রীম্' এমন উপাদেয় লেগেছিল যে আজও তা ভুলতে পারি নি— ঘটনাগুলো কিন্তু প্রায় মুছে গেছে মন থেকে। ওই বিনি পয়সার ভোজের মতোই কাঁচের বাসনগুলো হয়ে গিয়েছিল চকচকে আয়না, মাটনচপের হাড়গুলো হয়েছিল হাতির দাঁতের চুষিকাঠি, এ আমি ঠিকই বলছি। এই সভাতেই খামখেয়ালি সভার প্রস্তাব করেন রবিকাকা। সভার সভ্য যাকে-তাকে নেওয়া নিয়ম ছিল না, কিংবা সভাপতি প্রভৃতির ভেজাল ছিল না। ভালো কতক পাকা খামখেয়ালি তারাই হল মজলিশী সভ্য, বাকি সবাই আসতেন নিমন্ত্রিত হিসেবে। প্রত্যেক মজলিশী সভ্যের বাড়িতে একটা করে মাসে মাসে অধিবেশন হত। নতুন লেখা, অভিনয়, কত কী হত তার ঠিক নেই, সঠিক বিবরণও নেই কোথাও। কেবল চোঁতা কাগজে ঘটনাবলীর একটু একটু ইতিহাস টোকা আছে।

বাজনার চর্চা আমি অনেকদিন অবধি রেখেছিলুম। এক সময়ে দেখি ভেঙে গেল। স্পষ্ট মনে পড়ছে না কেন। শ্যামসুন্দর চলে গেল, রাধিকা গোঁসাই সমাজে কাজ নিলে, আর আসে না কেউ,

দিনু তখন গানবাজনা করে, কলকাতায় প্লেগ, মহামারী, তার পরে এল স্বদেশী হুজুগ। ঠিক কিসে যে আমার বাজনাটা বন্ধ হল তা মনে পড়ছে না।

তখন এক সময়ে হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল কেউ আমরা তা বলতে পারি নে। এল এইমাত্র জানি, আর তাতে ছেলে বুড়ো মেয়ে, বড়োলোক মুটে মজুর, সবাই মেতে উঠেছিল। সবার ভিতরেই যেন একটা তাগিদ এসেছিল। কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ। সবাই বলে, হুকুম আয়া। আরে, এই হুকুমই বা দিলে কে, কেন। তা জানে না কেউ, জানে কেবল— হুকুম আয়া। তাই মনে হয় এটা সবার ভিতর থেকে এসেছিল— রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, তিনিও বোধ হয় বলতে পারবেন না। কে দিল এই তাগিদ, কোত্থেকে এল এই স্বদেশী হুজুগ! আমি এখনো ভাবি, এ একটা রহস্য। বোধ হয় ভূমিকম্পের পরে একটা বিষম নাড়াচাড়া— সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। বড়ো-ছোটো মুটে-মজুর সব যেন এক ধাক্কায় জেগে উঠল। তখনকার স্বদেশী যুগে এখনকার মতো মারামারি ঝগড়াঝাঁটি ছিল না। তখন স্বদেশীর একটা চমৎকার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে। এমন একটা ঢেউ যাতে দেশ উর্বরা হতে পারত, ভাঙত না কিছু। সবাই দেশের জন্য ভাবতে শুরু করলে— দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্য কিছু করতে হবে। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন রবিকাকা। আমরা সব একদিন জুতোর দোকান খুলে বসলুম। বাড়ির বুড়ো সরকার খুঁতখুঁত করতে লাগল, বলে, বাবুরা ওটা বাদ দিয়ে স্বদেশী করুন-না— জুতোর দোকান খোলা, ও-সব কেন আবার। মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হল দোকানের সামনে— 'স্বদেশী ভাণ্ডার'। ঠিক হল স্বদেশী জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে। বলু খুব খেটেছিল— নানা দেশ ঘুরে যেখানে যা স্বদেশী জিনিস পাওয়া

যায়— মায় পায়ের আলতা থেকে মেয়েদের পায়ের জুতো সব-কিছু জোগাড় করেছিল, তার ওই শখ ছিল। পুরোদমে দোকান চলছে। শুধু কি দোকান— জায়গায় জায়গায় পল্লীসমিতি গঠন হচ্ছে। প্লেগ এল, সেবাসমিতি হল, তাতে সিস্টার নিবেদিতা এসে যোগ দিলেন। চারি দিক থেকে একটা সেল্‌ফ স্যাক্রিফাইসের ও একটা আত্মীয়তার ভাব এসেছিল সবার মনে।

পশুপতিবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, মাতৃভাণ্ডার সৃষ্টি হবে— ন্যাশনাল ফণ্ড— টাকা তুলতে হবে। ঘোড়ার গাড়ির ছাদের উপর মস্ত টিনের ট্রাঙ্ক, তাতে সাদা রঙে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা— মাতৃভাণ্ডার। সবাই চাঁদা দিলে— একদিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা উঠে গিয়েছিল মায়ের ভাণ্ডারে। অনেক সাহেবসুবোও ব্যাপার দেখতে ছুটেছিল, তারাও টুপি উড়িয়ে বন্দেমাতরম্ রব তুলেছিল থেকে থেকে। তারা পুলিসের লোক কি খবরের কাগজের রিপোর্টার তা কে জানে।

রামকেষ্টপুরের রেলের কুলিরা খবর দিলে, বাবুরা যদি আসেন আমাদের কাছে তবে আমরাও টাকা দেব। আমরা রবিকাকা সবাই ছুটলুম। তখন বর্ষাকাল-- একটা টিনের ঘরে আমাদের আড্ডা হল। এক মুহুরি টাকা গুণে নিলে। অতটুকু টিনের ঘরে তো মিটিং হতে পারে না। ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়ছে— বাইরে সারি সারি রেলগাড়ির নীচে শতরঞ্জি বিছিয়ে বক্তৃতা হচ্ছে আর আমি ভাবছি— এই সময়েই যদি ইঞ্জিন এসে মালগাড়ি টানতে শুরু করে তবেই গেছি আর কি। এই ভাবতে ভাবতে একটা কুলি এসে খবর দিলে সত্যিই একটা ইঞ্জিন আসছে। সবাই হুড়দাড় করে উঠে পড়লুম। শ-খানেক টাকা সেই কুলিদের কাছ থেকে পেয়েছিলুম।

ভূমিকম্পের বছর সেটা, নাটোর গেলুম সবাই মিলে, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স হবে। নাটোর ছিলেন রিসেপশন কমিটির

প্রেসিডেন্ট। সেখানে রবিকাকা প্রস্তাব করলেন, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে— বুঝবে সবাই। আমরা ছোকরারা ছিলুম রবিকাকার দলে। বললুম, হ্যাঁ, এটা হওয়া চাই যে করে হোক। তাই নিয়ে চাঁইদের সঙ্গে বাধল— তাঁরা কিছুতেই ঘাড় পাতেন না। চাঁইরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় সব বক্তৃতা-টক্তৃতা ইংরেজিতে তেমনিই হবে প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সে। প্যাণ্ডেলে গেলুম, এখন যে'ই বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ায় আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি, বাংলা, বাংলা। কাউকে আর মুখ খুলতে দিই না। ইংরেজিতে মুখ খুললেই 'বাংলা' 'বাংলা' বলে চেঁচাই। শেষটায় চাঁইদের মধ্যে অনেকেই বাগ মানলেন। লালমোহন ঘোষ এমন ঘোরতর সাহেব, তিনি ইংরেজি ছাড়া কখনো বলতেন না বাংলাতে, বাংলা কইবেন এ কেউ বিশ্বাস করতে পারত না— তিনিও শেষে বাংলাতেই উঠে বক্তৃতা করলেন। কী সুন্দর বাংলায় বক্তৃতা করলেন তিনি, যেমন ইংরেজিতে চমৎকার বলতে পারতেন বাংলা ভাষায়ও তেমনি। অমন আর শুনি নি কখনো। যাক, আমাদের তো জয়জয়কার। বাংলা ভাষার প্রচলন হল কন্‌ফারেন্সে। সেই প্রথম আমরা বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম। ভূমিকম্পের যে গল্প বলব তাতে এ-সব কথা আরো খোলসা করে শুনবে।

আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি। হাতে অন্নবস্ত্র বরাভয় —এক জাপানি আর্টিস্ট সেটিকে বড়ো করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলে। কোথায় যে গেল পরে পতাকাটা, জানি নে। যাক— রবিকাকা গান তৈরি করলেন, দিনুর উপর ভার পড়ল, সে দলবল নিয়ে সেই পতাকা ঘাড়ে করে সেই গান গেয়ে গেয়ে চোরবাগান ঘুরে চাঁদা তুলে নিয়ে এল। তখন সব স্বদেশের কাজ স্বদেশী ভাব এই ছাড়া আর কথা নেই। নিজেদের সাজ-সজ্জাও বদলে ফেললুম। এই সাজসজ্জার একটা মজার গল্প বলি শোনো।

তখনকার কালে ইঙ্গবঙ্গসমাজের চাঁই ছিলেন সব — নাম বলব না তাঁদের, মিছেমিছি বন্ধুমানুষদের চটিয়ে দিয়ে লাভ কী বলো। তখনকার কালে ইঙ্গবঙ্গসমাজ কী রকমের ছিল ধারণা করতে পারবে খানিকটা। একদিন সেই ইঙ্গবঙ্গসমাজে একটা পার্টি হবে, আমাদেরও নেমন্তন্ন। কী সাজে যাওয়া যায়। রবিকাকা বললেন, সব ধুতি-চাদরে চলো। পরলুম ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে দিলুম শুঁড়তোলা পাঞ্জাবী চটি। এখন খালি পায়ে কী করে যাই। চেয়ে দেখি রবিকাকার পায়ে মোজা, আমরাও চটপট মোজা পরে নিলুম। যাক, মোজা পরে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, তখনকার দিনে মোজা ছাড়া চলা, সে একটা ভয়ানক অসভ্যতা। আমি, দাদা, সমরদা ও রবিকাকা সেজেগুজে রওনা হলাম, সবাই আমরা মনে মনে ভাবছি, ইঙ্গবঙ্গের কেল্লায় কী রকম অভ্যর্থনা হবে, ভেবে একটু একটু হৃৎকম্পও হচ্ছে। কিছু দূর গেছি, দেখি রবিকাকা হঠাৎ এক-এক টানে দু-পায়ের মোজাদুটো খুলে গাড়ির পাদানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমাদের বললেন, আর মোজা কেন, ও খুলে ফেলো; আগাগোড়া দেশী সাজে যেতে হবে। আমরাও তাই করলুম, সেই গাড়িতে বসেই যার যার পা থেকে মোজা খুলে ফেলে দিলুম। পার্টি বেশ জমে উঠেছে, এমন সময়ে আমরা চার মূর্তি গিয়ে উপস্থিত। আমাদের সাজসজ্জা দেখে সবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, কেউ আর কথা কয় না। অনেকে ছিলেন আমাদের বিশেষ বন্ধু— আমাদের পরিবারের বন্ধু। কিন্তু সবাই গম্ভীর মুখে ঘাড় সোজা করে রইলেন, আমাদের দিকে ফিরে চাইলেন না আর। রবিকাকা চুপ করে রইলেন, কিছু বললেন না। আমরা বলাবলি করলুম একটু চোখ টিপে, রেগেছে, এরা খুব রেগেছে দেখছি। রেগেছে তো রেগেছে, কী আর করা যাবে— আমরা চুপ, সব-শেষের বেঞ্চিতে বসে রইলুম। পার্টির শেষে কী একটা অভিনয় ছিল, দিনু সেজেছিল

বুদ্ধদেব, তা দেখে বাড়ি ফিরে এলুম। পরে শুনেছি ওঁরা নাকি খুব চটে গিয়েছিলেন, বলেছেন, এ কী রকম ব্যবহার, এ কী অসভ্যতা, লেডিজদের সামনে দেশী সাজে আসা, তার উপর খালি পায়ে, মোজা পর্যন্ত না, ইত্যাদি সব। সেই-যে আমাদের ন্যাশনাল ড্রেস নাম হল, তা আর ঘুচল না। কিছুকাল বাদে দেখি বাইরেও সবাই সেই সাজ ধরতে আরম্ভ করেছে। এমন-কি, বিলেতফেরতারা ক্রমে ক্রমে ধুতি পরতে শুরু করলে। আমাদের কালে বিলেত-ফেরতাদের নিয়ম ছিল ধুতি বর্জন করা। আমাদের তো আর-কিছু ছিল না, ছিল কেবল মোজা, তাও সেই যে মোজা বর্জন করলুম আর ধরি নি কখনো। দেখো দিকিনি, এখনো বোধ হয় রবিকাকা মোজা পরেন না। ন্যাশনাল ড্রেস নাম হল কংগ্রেস থেকে। রবিকাকাই বললেন, কংগ্রেসকে ন্যাশনালাইজ করতে হবে। কলকাতায় সেবার কংগ্রেস হয়, দেশ-বিদেশের নেতারা এসেছিলেন অনেকেই। কর্তাদের শখ হল, এইখানেই সেই অতিথি-অভ্যাগতদের একটা পার্টি দিতে হবে। ঠিক হল সবাই ন্যাশনাল ড্রেসে আসবে। আমি বলি, সে কী করে হবে। রবিকাকা বললেন, না, তা হতেই হবে। তিনি নিমন্ত্রণপত্রে ছাপিয়ে দেওয়ালেন : all must come in national dress। তাতে একটা বিষম হৈ-চৈ পড়ে গেল ইঙ্গবঙ্গসমাজের চাঁইদের মধ্যে।

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা, বাড়ির গিন্নি থেকে চাকরবাকর দাসদাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘড়ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁর দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন। বাড়িতে তাঁত বসে গেল, খটাখট শব্দে তাঁত চলতে লাগল। মনে পড়ে এই বাগানেই সুতো রোদে দেওয়া হত। ছোটো ছোটো গামছা ধুতি তৈরি করে মা আমাদের দিলেন—সেই ছোটো ধুতি, হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই প'রে আমাদের

উৎসাহ কত।

একদিন রাজেন মল্লিকের বাড়ি থেকে ফিরছি, পল্লীসমিতির মিটিঙের পর, রাস্তার মোড়ে একটা মুটে মাথা থেকে মোট নামিয়ে সেলাম করে হাতে পয়সা কিছু গুঁজে দিলে, বললে, আজকের রোজগার। একদিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিয়ে দিলে। মুটেমজুরদের মধ্যেও কেমন একটা ভাব এসেছিল স্বদেশের জন্য কিছু করবার, কিছু দেবার।

রবিকাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। উৎসবের মন্ত্র অনুষ্ঠান সব জোগাড় করতে হবে, তখন তো তোমাদের মতো আমাদের আর বিধুশেখর শাস্ত্রীমশায় ছিলেন না, ক্ষিতিমোহনবাবুও ছিলেন না কিছু-একটা হলেই মন্ত্র বাৎলে দেবার। কী করি, থাকবার মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন কথক ঠাকুর, রোজ কথকতা করতেন আমাদের বাড়ি, কালো মোটাসোটা তিলভাণ্ডেশ্বরের মতো চেহারা। তাঁকে গিয়ে ধরলুম, রাখীবন্ধন-উৎসবের একটা অনুষ্ঠান বাৎলে দিতে হবে। তিনি খুব খুশি ও উৎসাহী হয়ে উঠলেন, বললেন, এ আমি পাঁজিতে তুলে দেব, পাঁজির লোকদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, এই রাখীবন্ধন-উৎসব পাঁজিতে থেকে যাবে। ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব— রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়। কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী আর করি— হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে বললুম, নে সব কাপড়-জামা, নিয়ে চল্‌ সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চলল স্নানে, মনিব চাকর একসঙ্গে সব স্নান হবে। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—

মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥

এই গানটি সে সময়েই তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চার দিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে—এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চিৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হল, চলো সব। এইবারে বেগতিক—আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না। তার উপর রবিকাকার খেয়াল, কোথা দিয়ে কোথায় যাবেন আর আমাকে হাঁটিয়ে মারবেন। আমি করলুম কী, আর উচ্চবাচ্য না করে যেই-না আমাদের গলির মোড়ে মিছিল পৌঁছানো, আমি সট্ করে একেবারে নিজের হাতার মধ্যে প্রবেশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। রবিকাকার খেয়াল নেই

—সোজা এগিয়েই চললেন মসজিদের দিকে, সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরো সব ডাকাবুকো লোক।

এ দিকে দীপুদাকে বাড়িতে এসে এই খবর দিলুম, বললুম, কী একটা কাণ্ড হয় দেখো। দীপুদা বললেন, এই রে, দিনুও গেছে, দারোয়ান দারোয়ান, যা শিগগির, দেখ্ কী হল— বলে মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। আমরা সব বসে ভাবছি— এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী, কী হল সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে, কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবী-টৌলবী যাদের পেলুম হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে— ওরা একটু হাসলে মাত্র। যাক্, বাঁচা গেল। এখন হলে-- এখন যাও তো দেখি, মসজিদের ভিতরে গিয়ে রাখী পরাও তো— একটা মাথা-ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে।

তখন পুলিসের নজর যে কিছুই নেই আমাদের উপরে, তা নয়। একবার আমাদের উপরের দোতলার হলে একটা মিটিং হচ্ছে, রাখীবন্ধনের আগের দিন রাত্তিরে, উৎসবের কী করা হবে তার আলোচনা চলছিল। সেদিন ছিল বাড়িতে অরন্ধন, শাস্ত্র থেকে সব নেওয়া হয়েছিল তো! মেয়েরা সেবারে দেশ-বিদেশ থেকে ফোঁটা রাখী পাঠিয়েছিল রবিকাকাকে। হ্যাঁ, মিটিং তো হচ্ছে— তাতে ছিলেন এক ডেপুটিবাবু। আমাদের সে-সব মিটিঙে কারো আসবার বাধা ছিল না। খুব জোর মিটিং চলছে, এমন সময়ে দারোয়ান খবর দিলে, পুলিস সাহেব উপর আনে মাঙ্‌তা।

সব চুপ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। রবিকাকা দারোয়ানকে বললেন, যাও, পুলিস সাহেবকে নিয়ে এসো উপরে।

ডেপুটিবাবুর অভ্যেস ছিল, সব সময়ে তিনি হাতের আঙুলগুলি নাড়তেন আর এক দুই তিন করে জপতেন। তাঁর কর-জপা বেড়ে

গেল পুলিস সাহেবের নাম শুনে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, আমার এখানে তো আর থাকা চলবে না। পালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, বেড়ালের নাম শুনে যেমন ইঁদুর পালাই-পালাই করে। আমি বললুম, কোথায় যাচ্ছেন আপনি, সিঁড়ি দিয়ে নামলে তো এখুনি সামনাসামনি ধরা পড়ে যাবেন। তিনি বললেন, তবে, তবে— করি কী, উপায় ? আমি বললুম, এক উপায় আছে, এই ড্রেসিং-রুমে ঢুকে পড়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে থাকুন গে। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে তাই করলেন— ড্রেসিং-রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রবিকাকা মুখ টিপে হাসলেন। দারোয়ান ফিরে এল— জিজ্ঞেস করলুম, পুলিস সাহেব কই। দারোয়ান বললে, পুলিস সাহেব সব পুছকে চলা গয়া। পুলিস জানত সব, আমাদের কোনো উপদ্রব করত না, যে যা মিটিং করতাম— পুলিস এসেই খোঁজখবর নিয়ে চলে যেত, ভিতরে আর আসত না কখনো।

বেশ চলছিল আমাদের কাজ। মনে হচ্ছিল এবারে যেন একটা ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিভাইভাল হবে দেশে। দেশের লোক দেশের জন্য ভাবতে শুরু করেছে, সবার মনেই একটা তাগিদ এসেছে, দেশকে নতুন একটা-কিছু দিতে হবে। এমন সময়ে সব মাটি হল যখন একদল নেতা বললেন, বিলিতি জিনিস বয়কট করো। দোকানে দোকানে তাদের চেলাদের দিয়ে ধন্না দেওয়ালেন, যেন কেউ না গিয়ে বিলিতি জিনিস কিনতে পারে। রবিকাকা বললেন, এ কী, যার ইচ্ছে হয় বিলিতি জিনিস ব্যবহার করবে, যার ইচ্ছে হয় করবে না। আমাদের কাজ ছিল লোকের মনে আস্তে আস্তে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া— জোরজবরদস্তি করা নয়। মাড়োয়ারি দোকানদার এসে হাতে-পায়ে ধরে অনেক টাকা দিয়ে এ বছরের বিলিতি মাল-গুলো কাটাবার ছাড় চাইলে। নেতারা কিছুতেই মানলেন না। রবিকাকা বলেছিলেন এদের এক বছরের মতো ছেড়ে দিতে— মিছেমিছি দেশের লোকদের লোকসান করিয়ে কী হবে। নেতারা

সে সুপরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। বিলিতি বর্জন শুরু হল, বিলিতি কাপড় পোড়ানো হতে লাগল, পুলিসও ক্রমে নিজমূর্তি ধরল। টাউন হলে পাবলিক মিটিঙে যেদিন সুরেন বাঁড়ুজ্জে বয়কট ডিক্লেয়ার করলেন রবিকাকা তখন থেকেই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এর মধ্যে নেই।

গেল আমাদের স্বদেশী যুগ ভেঙে। কিন্তু এই যে স্বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলুম, দেশের জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হল আমার ছবির জগতে। তখন বাজনা করি, ছবিও আঁকি— গানবাজনাটা আমার ভিতরে ছিল না, সেটা গেল— ছবিটা রইল।

ছবি দেশীমতে ভাবতে হবে, দেশীমতে দেখতে হবে। রবিবর্মাও তো দেশীমতে ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু বিদেশী ভাব কাটাতে পারেন নি, সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে। সেইখানে হল আমার পালা। বিলিতি পোর্‌ট্রেট আঁকতুম, ছেড়েছুড়ে দিয়ে পট পটুয়া জোগাড় করলুম। যে দেশে যা-কিছু নিজের নিজের শিল্প আছে, সব জোগাড় করলুম। যত রকম পট আছে সব স্টাডি করলুম, সেই খাতাটি এখনো আমার কাছে।

তার পর দেশীমতে দেশী ছবি আঁকতে শুরু করলুম। এক-এক সময়ে এক-একটা হাওয়া আসে, ধীরে ধীরে আপনিই চালিয়ে নিয়ে যায়। দড়িদড়া ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম, নৌকো দিলুম খুলে স্রোতের মুখে। বিলিতি আর্ট দূর করে দিয়ে দেশী আর্ট ধরলুম। তার পর স্বদেশী যুগ, দেশের আবহাওয়া, এ-সব হচ্ছে সুবাতাস। সেই সুবাতাস ধীরে ধীরে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলল।

দেখি আমাদের দেশী দেবদেবীর ছবি নেই। নন্দলালদের দিয়ে আমি তাই নানান দেবদেবীর ছবি আঁকিয়েছি। আর্ট স্টুডিয়ো থেকে যা-সব দেবদেবীর ছবি বের হত তখন। আমি বললুম নন্দলালকে, আঁকো যমরাজ, অগ্নিদেবতা, আরো সব

দেবতার ছবি, থাকুক এক-একটা 'ক্যারেক্‌টার' লোকের চোখের সামনে। আমার আবার দেবতার ছবি ভালো আসে না, যা কৃষ্ণচরিত্র করেছিলুম তাও ভিতর থেকে ওটা কী রকম খেলে গিয়েছিল ব'লে। নয়তো আমার ভালো দেবদেবীর ছবি নেই। তা, নন্দলালরা বেশ কতকগুলো দেবতার ছবি এঁকে গিয়েছে, লোকেরা নিয়েছেও তা। ছবি আঁকবার আমার আর-একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, ছবি আঁকা এমন সহজ করে দিতে হবে যাতে সব ছেলেমেয়েরা নির্ভয়ে এঁকে যাবে। তখন আর্ট শেখা ছিল মহা ভয়ের ব্যাপার। সেটা আমার মনে লেগেছিল। তাই ভেবেছিলুম এই ভয় ঘোচাতে হবে, ছবি আঁকা এত সহজ করে দেব। কারণ এটা আমি নিজে অনুভব করেছি আমার ভাষার বেলায়। রবিকাকা আমাকে নির্ভয় করে দিয়েছিলেন। তা, আমিও ছবি আঁকার বেলায় নির্ভয় তো করে দিলুম, দিয়ে এখন আমার ভয় হয় যে কী করলুম। এখন যা-সব নির্ভয়ে ছবি আঁকা শুরু করেছে, ছবি এঁকে আনছে -- এ যেন সেই ব্রহ্মার মতো। কী যেন একটা গল্প আছে যে ব্রহ্মা একবার কোনো একটি রাক্ষস তৈরি করে নিজেই প্রাণভয়ে অস্থির, রাক্ষস তাঁকে খেতে চায়। ভাবি, আমার বেলায়ও তাই হয় বা। আমার ছবির মূল কথা ছিল, ওই আর্টকে নিজের করতে হবে, পার?— সহজ করতে হবে। আমি তো বলি যে আর্টের তিনটে স্তর তিনটে মহল আছে— একতলা, দোতলা, তেতলা। একতলার মহলে থাকে দাসদাসী তারা সব জিনিস তৈরি করে। তারা সার্ভিস দেয়, ভালো রান্না করে দেয়, ভালো আসবাব তৈরি করে দেয়। তারা হচ্ছে সার্ভার, মানে ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান— তারা একতলা থেকে সব-কিছু করে দেয়। দোতলা হচ্ছে বৈঠকখানা। সেখানে থাকে ঝাড়লণ্ঠন, ভালো পর্দা, কিংখাবের গদি, চার দিকে সব-কিছু ভালো ভালো জিনিস, যা তৈরি হয়ে আসে একতলা থেকে, দোতলায় বৈঠকখানায় সে-সব

সাজানো হয়। সেখানে হয় রসের বিচার, আসেন সব বড়ো বড়ো রসিক পণ্ডিত। সেখানে সব নটীর নাচ, ওস্তাদের কালোয়াতি গান, রসের ছড়াছড়ি— শিল্পদেবতার সেই হল খাস-দরবার। তেতলা হচ্ছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল। সেখানে শিল্পী বিভোর, সেখানে সে মা হয়ে শিল্পকে পালন করছে, সেখানে সে মুক্ত, ইচ্ছেমত শিশু-শিল্পকে সে আদর করছে, সাজাচ্ছে।

আর্টের আছে এই তিনটে মহল। এই তিনটি মহলেরই দরকার আছে। নীচের তলার ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানেরও দরকার, তারা সব জিনিস তৈরি করে দেবে দোতলার জন্য। ভালো রান্না করে দেবে, নয়তো দোতলায় তুমি রসিকজনদের ভালো জিনিস খাওয়াবে কী করে। দোতলায় হয় রসের বিচার। আর তেতলায় হচ্ছে মায়ের মতো শিশুকে পালন করা। গাছের শিকড় যেমন থাকে মাটির নীচে, আর ডালের ডগায় কচি পাতাটি যেমন হাত বাড়িয়ে থাকে আলোবাতাসের দিকে, তেতলা হচ্ছে তাই। এখন দেখতে হবে কাদের কোন্ তলায় ঠাঁই। সব মহলেই জিনিয়াস তৈরি হতে পারে, জিনিয়াসের ঠাঁই হতে পারে। এইভাবে যদি দেখতে শেখ তবেই সব সহজ হয়ে যাবে। এই যে রবিকাকা আজকাল ছোটো ছোটো গল্প লিখছেন, এ হচ্ছে ওই তেতলার অন্তরমহলের ব্যাপার। উনি নিজেই বলেছেন সেদিন, এখন আমি খ্যাতি-অখ্যাতির বাইরে। তাই উনি অন্দরমহলে বসে আপন শিশুর সঙ্গে খেলা করছেন, তাকে আদর করে সাজিয়ে তুলছেন। সেখানে একটি মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে, দুটি রূপকথা— এ সবাই বুঝতে পারে না।

আমার এই-যে এখনকার পুতুল গড়া, এও হচ্ছে ওই অন্দর-মহলেরই ব্যাপার। আমি তাই এক-এক সময়ে ভাবি, আগে যে যত্ন নিয়ে ছবি আঁকতুম এখন আমি সেই যত্ন নিয়েই পুতুল গড়ছি, সাজাচ্ছি, তাকে বসাচ্ছি কত সাবধানে। নন্দলালকে জিজ্ঞেস

করলুম, এ কি আমি ঠিক করছি। সেদিন আমার পুরোনো চাকরটা এসে বললে, বাবু, আপনি এ-সব ফেলে দিন। দিনরাত কাঠকুটো নিয়ে কী যে করেন, সবাই বলে আপনার ভীমরতি হয়েছে। আমি বললুম, ভীমরতি নয়, বাহাত্তুরে বলতে পারিস, দু-দিন বাদে তো তাই হব। তাকে বোঝালুম, দেখ্, ছেলেবেলায় যখন প্রথম মায়ের কোলে এসেছিলুম তখন এই ইট কাঠ ঢেলা নিয়েই খেলেছি, আবার ওই মায়ের কোলেই শেষে ফিরে যাবার বয়স হয়েছে কিনা, তাই আবার সেই ইট কাঠ ঢেলা নিয়েই খেলা করছি। নন্দলাল বললে, তা নয়, আপনি এখন দুরবীনের উল্টো দিক দিয়ে পৃথিবী দেখছেন। কথাটা আমিই একদিন ওকে বলেছিলুম, সবাই দুরবীনের সোজা দিক দিয়ে দেখে, কিন্তু উল্টো পিঠ দিয়ে দেখো দিকিনি, কেমন মজার খুদে খুদে সব দেখায়। ছেলেবেলায় আমি আর-এক কাণ্ড করতুম— হাতের উপর ভর দিয়ে মাথা নীচের দিকে পা দুটো উপরের দিকে তুলে পায়ের নীচে দিয়ে গাছপালা দেখতুম, বেড়ে মজা লাগত।

নন্দলাল তাই বললে, আপনিও এখন দুরবীনের উল্টো দিক দিয়েই সবকিছু দেখছেন।

এই দুরবীনের উল্টো পিঠ দিয়ে দেখা, এও একটা শখ।

২

সেকালে শখ বলে একটা জিনিস ছিল। সবার ভিতরে শখ ছিল, সবাই ছিল শৌখিন। একালে শৌখিন হতে কেউ জানে না, জানবে কোথেকে। ভিতরে শখ নেই যে। এই শখ আর শৌখিনতার কতকগুলো গল্প বলি শোনো।

উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন মহা শৌখিন। তাঁর শখ ছিল কাপড়চোপড় সাজগোজে। সাজতে তিনি খুব ভালোবাসতেন, ঋতুর সঙ্গে রঙ মিলিয়ে সাজ করতেন। ছয় ঋতুতে ছয় রঙের

সাজ ছিল তাঁর। আমরা ছেলেবেলায় নিজের চোখে দেখেছি, আশি বছরের বুড়ো তখন তিনি, বসন্তকালে হলদে চাপকান, জরির টুপি মাথায়, সাজসজ্জায় কোথাও একটু ক্রুটি নেই, বের হতেন বিকেল বেলা হাওয়া খেতে। তাঁর শখ ছিল ওই, বিকেল-বেলায় সেজেগুজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গিন্নিকে ডেকে বলতেন, দেখো তো গিন্নি, ঠিক হয়েছে কিনা। গিন্নি এসে হয়তো টুপিটা আর-একটু বেঁকিয়ে দিয়ে, গোঁফজোড়া একটু মুচড়ে দিয়ে, ভালো করে দেখে বলতেন, হ্যাঁ, এবারে হয়েছে। গিন্নি সাজ 'অ্যাপ্রুভ' করে দিলে তবে তিনি বেড়াতে বের হতেন। তিনি যদি অ্যাপ্রুভ না করতেন তবে সাজ বদল হয়ে যেত। রোজ এই বিকেলের সাজটিতে ছিল তাঁর শখ। দাদামশায়ের শখ ছিল বোটে চড়ে বেড়ানো। পিনিস তৈরি হয়ে এল— পিনিস কী জান, বজরা আর পানসি, পিনিস হচ্ছে বজরার ছোটো আর পানসির বড়ো ভাই— ভিতরে সব সিল্কের গদি, সিল্কের পর্দা, চার দিকে আরামের চুড়োন্ত।

ফি রবিবারেই শুনেছি দাদামশায় বন্ধু-বান্ধব ইয়ার-বক্সী নিয়ে বের হতেন— সঙ্গে থাকত খাতা-পেন্সিল, তাঁর ছবি আঁকার শখ ছিল, দু-একজোড়া তাসও থাকত বন্ধু-বান্ধবদের খেলবার জন্য। এই জগন্নাথ ঘাটে পিনিস থাকত, এখান থেকেই তিনি বোটে উঠতেন। পিনিসের উপরে থাকত একটা দামামা, দাদামশায়ের পিনিস চলতে শুরু হলেই সেই দামামা দকড় দকড় করে পিটতে থাকত, তার উপরে হাতিমার্কা নিশেন উড়ছে পত পত করে। ওই তাঁর শখ, দামামা পিটিয়ে চলতেন পিনিসে। ওই বোটেতে খুব যখন তাসখেলা জমেছে, গল্পসল্প বন্ধ, উনি করতেন কী, টপাস করে খানকয়েক তাস নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিতেন, আর হো-হো করে হাসি। বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠতেন, করলেন কী, রঙের তাস ছিল যে। তা আর হয়েছে কী, আবার এক ঘাটে নেমে নতুন তাস এল।

ওই মজা ছিল তাঁর। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। অনেক ফারমাশী কবিতাই ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন সে সময়ে। ঈশ্বর গুপ্তের ওই গ্রীষ্মের কবিতা দাদামশায়ের ফরমাশেই লেখা। বেজায় গরম, বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে তখন, ডাবের জল, বরফ, এটা-ওটা খাওয়া হচ্ছে— দাদামশাই বললেন, লেখো তো ঈশ্বর, একটা গ্রীষ্মের কবিতা। তিনি লিখলেন—

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল,
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল্।

দাদামশায়ের আর-একটা শখ ছিল ঝড় উঠলেই বলতেন ঝড়ের মুখে পাল তুলে দিতে। সঙ্গীরা তো ভয়ে অস্থির— অমন কাজ করবেন না। না, পাল তুলতেই হবে, হুকুম হয়েছে। সেই ঝড়ের মুখেই পাল তুলে দিয়ে পিনিস ছেড়ে দিতেন, ডোবে কি উল্টোয় সে ভাবনা নেই। পিনিস উড়ে চলেছে হুহু করে, আর তিনি জানালার ধারে বসে ছবি আঁকছেন। একেই বলে শখ।

দাদামশায়ের যাত্রা করবার শখ, গান বাঁধবার শখ— নানা শখ নিয়ে তিনি থাকতেন। ব্যাটারি চালাতেন, কেমিস্ট্রীর শখ ছিল। আর শৌখিনতার মধ্যে ছিল দুটো 'পিয়ার্‌গ্লাস' তাঁর বৈঠকখানার জন্য। বিলেতে নবীন মুখুজ্জেকে লিখলেন— বাবাকে বলে এই দুটো যে করে হোক জোগাড় করে পাঠাও। তিনি লিখলেন, এখানে বড়ো খরচ, গভর্নার বড়ো ক্লোজ-ফিস্টেড হয়েছেন। তবে দরবার করেছি। হুকুমও হয়ে গেছে, কার-টেগোর কোম্পানির জাহাজ যাচ্ছে, তাতে তোমার দুটো 'পিয়ার্‌গ্লাস' আর ইলেকট্রিক ব্যাটারি খালাস করে নিয়ো।

কানাইলাল ঠাকুরের শখ ছিল পোশাকি মাছে। ছেলেবেলা থেকে শখ পোশাকি মাছ খেতে হবে। বামুনকে প্রায়ই হুকুম করতেন পোশাকি মাছ চাই আজ। সে পুরোনো বামুন, জানত পোশাকি মাছের ব্যাপার, অনেকবারই তাকে পোশাকি মাছ রান্না

করে দিতে হয়েছে। বড়ো বড়ো লালকোর্তাপরা চিংড়িমাছ সাজিয়ে সামনে ধরল, দেখে ভারি খুশি, পোশাকি মাছ এল।

জগমোহন গাঙ্গুলি মশায়ের ছিল রান্নার আর খাবার শখ। হরেক রকমের রান্না তিনি জানতেন। পাকা রাঁধিয়ে ছিলেন, কি বিলিতি কি দেশী। গায়ে যেমন ছিল অগাধ শক্তি, খাইয়েও তেমনি। ভালো রান্না আর ভালো খাওয়া নিয়েই থাকতেন তিনি সকাল থেকে সন্ধে ইস্তিক। অনেকগুলো বাটি ছিল তাঁর, সকাল হলেই তিনি এ বাড়ি ও বাড়ি ঘরে ঘরে একটা করে বাটি পাঠিয়ে দিতেন। যার ঘরে যা ভালো রান্না হত, একটা তরকারি ওই বাটিতে করে আসত। সব ঘর থেকে যখন তরকারি এল তখন খোঁজ নিতেন, দেখ্ তো মেথরদের বাড়িতে কী রান্না হয়েছে আজ। সেখানে হয়তো কোনোদিন হাঁসের ডিমের ঝোল, কোনোদিন মাছের ঝোল— তাই এল খানিকটা বাটিতে করে। এই-সব নিয়ে তিনি রোজ মধ্যাহ্নভোজনে বসতেন। এমনি ছিল তাঁর রান্না আর খাওয়ার শখ। এইরকম সব ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসী নানা রকমের লোক ছিল তখনকার কালে।

কারো আবার ছিল ঘুড়ি ওড়াবার শখ। কানাই মল্লিকের শখ ছিল ঘুড়ি ওড়াবার। ঘুড়ির সঙ্গে পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট পর পর গেঁথে দিয়ে ঘুড়ি ওড়াতেন, সুতোর প্যাঁচ খেলতেন। এই শখে আবার এমন 'শক্' পেলেন শেষটায়, একদিন যথাসর্বস্ব খুইয়ে বসতে হল তাঁকে। সেই অবস্থায়ই আমরা তাঁকে দেখেছি, আমাদের কুকুরছানাটা পাখিটা জোগাড় করে দিতেন।

ওই ঘুড়ি ওড়াবার আর-একটা গল্প শুনেছি আমরা ছেলেবেলায়, মহর্ষিদেব, তাঁকে আমরা কর্তাদাদামশায় বলতুম, তাঁর কাছে। তিনি বলতেন, আমি তখন ডালহৌসি পাহাড়ে যাচ্ছি, তখনকার দিনে তো রেলপথ ছিল না, নৌকো করেই যেতে হত, দিল্লী ফোর্টের নীচে দিয়ে বোট চলেছে— দেখি কেল্লার বুরুজের উপর

দাঁড়িয়ে দিল্লীর শেষ বাদশা ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। রাজ্য চলে যাচ্ছে, তখনো মনের আনন্দে ঘুড়িই ওড়াচ্ছেন। তার পর মিউটিনির পর আমি যখন ফিরছি তখন দেখি কানপুরের কাছে— সামনে সব সশস্ত্র পাহারা— শেষ বাদশাকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে ইংরেজরা। তাঁর ঘুড়ি ওড়াবার পালা শেষ হয়েছে।

কর্তাদাদামশায়েরও শখ ছিল এক কালে পায়রা পোষার, বাল্যকালে যখন স্কুলে পড়েন। তাঁর ভাগনে ছিলেন ঈশ্বর মুখুজ্জে —তাঁর কাছেই আমরা সেকালের গল্প শুনেছি। এমন চমৎকার করে তিনি গল্প বলতে পারতেন, যেন সেকালটাকে গল্পের ভিতর দিয়ে জীবন্ত করে ধরতেন আমাদের সামনে। সেই ঈশ্বর মুখুজ্জে আর কর্তাদাদামশায় স্কুল থেকে ফেরবার পথে রোজ টিরিটিবাজারে যেতেন, ভালো ভালো পায়রা কিনে এনে পুষতেন। আমাদের ছেলেবেলায় একদিন কী হয়েছিল তার একটা গল্প বলি শোনো, এ আমাদের নিজে চোখে দেখা। কর্তাদাদামশায় তখন বুড়ো হয়ে গেছেন, বোলপুর না পরগনা থেকে ফিরে এসেছেন। বাবা তখন সবে মারা গেছেন, তাই বোধ হয় আমাদের বাড়িতে এসে সবাইকে একবার দেখেশুনে যাবার ইচ্ছে। বললেন, কুমুদিনী-কাদম্বিনীকে খবর দাও আমি আসছি। খবর এল, কর্তামশায় আসবেন, বাড়িতে হৈ-হৈ রব পড়ে গেল। আমার তখন নয় কি দশ বছর বয়স। আমাদের ভালো কাপড়-জামা পরিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যেন কোনোরকম বেয়াদপি দুষ্টুমি না করি। চাকর-বাকররাও সাজপোশাক পরে ফিটফাট, একেবারে কায়দাদোরস্ত। বাড়িঘর ঝাড়পোঁছ সাজানো-গোছানো হল। আজ কর্তাদাদামশায় আসবেন। সকাল থেকে ঈশ্বরবাবু সদরি-টদরি পরে এলেন আমাদের বাড়িতে। সত্তর বছরের বুড়ো সেজেগুজে, কানে আবার একটু আতরের ফায়া গুঁজে তৈরি। নিয়ম ছিল তখনকার দিনে পুজোর সময় ওই-সব সাজ পরার।

সকাল থেকে তো ঈশ্বরবাবু এসে বসে আছেন— আমরা বললুম, তুমি আর কেন বসে আছ সেজেগুজে। কর্তাদাদামশায় তোমাকে চিনতেই পারবেন না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, চিনতে পারবেন না! ছেলেবেলায় একসঙ্গে স্কুলফেরত কত পায়রা কিনেছি, দুজনে পায়রা পুষেছি। আমাকে চিনতে পারবেন না, বললেই হল! দেখো ভাই, দেখো। আমরা বললুম, তুমিই দেখে নিয়ো, সে ছেলেবেলার কথা কি আর উনি মনে করে রেখেছেন। এখন উনি মহর্ষিদেব, পায়রার কথা ভুলে বসে আছেন। কর্তাদাদামশায় তো এলেন। বড়োপিসেমশায়, ছোটোপিসেমশায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, কে, যোগেশ ? নীলকমল ? বেশ বেশ, ভালো তো ? উপরে এলেন কর্তাদাদামশায়। আমরা সব বারান্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম, আস্তে আস্তে এসে ভক্তিভরে পেন্নাম করলুম— জিজ্ঞেস করলেন, এরা কে কে। পিসেমশায়রা পরিচয় করিয়ে দিলেন, এ গগন, এ সমর, এ অবন। সব ছেলেকে কাছে ডেকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। একে-একে সবাই আসছে, পেন্নাম করছে। দূরে ঈশ্বরবাবুর মুখে কথাটি নেই। হঠাৎ কর্তাদাদামশায়ের নজর পড়ল ঈশ্বরবাবুর উপরে। এই-যে ঈশ্বর— ব'লে দু হাতে তাকে বুকে জাপটে ধরে কোলাকুলি। সে কোলাকুলি আর থামে না। বললেন, মনে আছে ঈশ্বর, আমরা স্কুল পালিয়ে টিরিটিবাজারে পায়রা কিনতে যেতুম, মনে আছে ? আরে, সেই ঈশ্বর তুমি— ব'লে এক বুড়ো আর-এক বুড়োকে কী আলিঙ্গন! অনেক দিন পরে দেখা দুই বাল্যবন্ধুতে, দেখে মনে হল যেন দুই বালকে কথা হচ্ছে এমনি গলার স্বর হয়ে গেছে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে। ঈশ্বরবাবুর আহ্লাদ আর ধরে না, কর্তাদাদামশায়ের আলিঙ্গন পেয়ে। তার পর কর্তাদাদামশায় মা-পিসিমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তো চলে গেলেন। এতক্ষণে ঈশ্বরবাবুর বুলি ফুটল ; বললেন, দেখলে, বলেছিলে না উনি চিনবেন না আমাকে— দেখলে তো ? ঠিক

মনে আছে পায়রা-কেনার গল্প। তোমাদের তো আলাপ করিয়ে দিতে হল, আর আমাকে— আমাকে তো উনি দেখেই, চিনে ফেললেন।

কর্তাদাদামশায়ের এক সময়ে গানবাজনার শখ ছিল, জানো? শুনবে সে গল্প? বলব? আচ্ছা, বলি। তখন পরগনা থেকে টাকা আসত কলসীতে করে। কলসীতে করে টাকা এলে পর সে টাকা সব তোড়া বাঁধা হত। টাকা গোনার শব্দ আর এখন শুনতে পাই না, ঝন্ ঝন্ রুপোর টাকার শব্দ। এখন সব নোট হয়ে গেছে। কর্তার 'পার্সোনাল' খরচ, সংসারখরচ, অমুক খরচ, ও বাড়ির এ বাড়ির খরচ যেখানে যা দরকার ঘরে ঘরে ওই এক-একটি তোড়া পৌঁছিয়ে দেওয়া হত, তাই থেকে খরচ হতে থাকত। এখন এই-যে আমার নীচের তলার সিঁড়ির কাছে যেখানে ঘড়িটা আছে, সেখানে মস্ত পাথরের টেবিলে সেই টাকা ভাগ ভাগ করে তোড়া বাঁধা হত। এ বাড়ি ছিল তখন বৈঠকখানা। এ বাড়িতে থাকতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, জমিদারির কাজকর্ম তিনি নিজে দেখতেন। কর্তাদাদামশায় তখন বাড়ির বড়ো ছেলে। মহা শৌখিন তিনি তখন, বাড়ির বড়ো ছেলে। ও বাড়ি থেকে রোজ সকালে একবার করে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পেন্নাম করতে আসতেন —তখনকার দস্তুরই ছিল ওই; সকালবেলা একবার এসে বাপকে পেন্নাম করে যাওয়া। ছোকরা-বয়স, দিব্যি সুন্দর ফুটফুটে চেহারা, সে-সময়ের একটা ছবি আছে রথীর কাছে, দেখো। বেশ সলমা-চুমকি-দেওয়া কিংখাবের পোশাক পরা। তখন কর্তাদাদামশায় ষোলো বছরের— সেই বয়সের চেহারার সেই ছবিটা পরে মাঝে মাঝে দেখতে পছন্দ করতেন, প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন আমাকে, ছবিটা যত্ন করে রেখেছ তো— দেখো, নষ্ট কোরো না যেন।

যে কথা বলছিলুম। তা, কর্তাদাদামশায় তো যাচ্ছেন বৈঠকখানায় বাপকে পেন্নাম করতে— যেখানে তোড়া বাঁধা হচ্ছে সেখান

দিয়েই যেতে হত। সঙ্গে ছিল হরকরা— তখনকার দিনে হরকরা সঙ্গে সঙ্গে থাকত জরির তকমাপরা, হরকরার সাজের বাহার কত। এই যে এখন আমি এখানে এসেছি, তখনকার কাল হলে হরকরাকে ওই পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হত, নিয়ম ছিল তাই। কর্তা-দাদামশায় তো বাপকে পেন্নাম করে ফিরে আসছেন। সেই ঘরে, যেখানে দেওয়ানজি ও আর-আর কর্মচারীরা মিলে টাকার তোড়া ভাগ করছিলেন, সেখান এসে হরকরাকে হুকুম দিলেন— হরকরা তো দু-হাতে দুটো তোড়া নিয়ে চলল বাবুর পিছু পিছু। দেওয়ানজিরা কী বলবেন— বাড়ির বড়ো ছেলে, চুপ করে তাকিয়ে দেখলেন। এখন, হিসেব মেলাতে হবে— দ্বারকানাথ নিজেই সব হিসাব নিতেন তো। দুটো তোড়া কম। কী হল।

আজ্ঞে বড়োবাবু—

ও, আচ্ছা—

এখন দু-তোড়া টাকা কিসে খরচ হল জান ? গানবাজনার ব্যবস্থা হল পুজোর সময়। ছেলেরা বাড়িতে আমোদ করবে পুজোর সময়। খুব গানবাজনার তখন চলন ছিল বাড়িতে। কুমোর এসে ঘরে ঘরে প্রতিমা গড়ত ; দাদামশায় কুমোরকে দিয়ে ফরমাশমত প্রতিমার মুখের নতুন ছাঁচ তৈরি করালেন। এখনো আমাদের পরিবারের যেখানে যেখানে পুজো হয় সেই ছাঁচেরই প্রতিমা গড়া হয়।

কর্তাদাদামশায়ের কালোয়াতি গান শেখবার শখ ছিল, সে তো আগেই বলেছি। তিনি নিজেও আমাদের বলেছিলেন, আমি পিয়ানো শিখেছিলুম ছেলেবেলায় সাহেব মাস্টারের কাছ থেকে তা জানো ?

আমরা তাঁর গানবাজনা শুনি নি কখনো, কিন্তু তাঁর মন্ত্র আওড়ানো শুনেছি। আহা, সে কী সুন্দর, কী পরিষ্কার উচ্চারণ, সে শব্দে চারি দিক যেন গম্‌গম্‌ করত।

কর্তাদাদামশায়ের নাক ছিল দারুণ। আমরা তাঁর কাছে

যেতুম না বড়ো বেশি, তবে কখনো বিশেষ বিশেষ দিনে পেন্নাম করতে যেতে হলে হাত-পা ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে, গায় একটু সুগন্ধ দিয়ে, মুখে একটি পান চিবোতে চিবোতে যেতুম। পাছে কোনোরকম তামাক-চুরুটের গন্ধ পান। আমাদের ছিল আবার তামাক খাওয়া অভ্যেস। একবার কী হয়েছে, পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে বাপ-ছেলেতে আছেন— উপরের তলায় থাকেন কর্তাদাদা মশায়, নীচের তলায় বড়ো ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বড়ো-জ্যাঠামশায় তখন পাইপ খেতেন। একদিন বড়োজ্যাঠামশায় নীচের তলায় চানের ঘরে পাইপ টানছেন। উপরের ঘরে ছিলেন কর্তাদাদামশায় শুয়ে, চেঁচিয়ে উঠলেন, এ-ই! চাকর-বাকরের নাম ধরে কখনো ডাকতেন না, 'এ-ই' বলে ডাকলেই সব ছুটে যেত। তিনি বললেন, গাঁজা খাচ্ছে কে। চাকররা তো ছুটোছুটি করতে লাগল বাড়িময়, খোঁজ খোঁজ, শেষে দেখে বড়োজ্যাঠা-মশায়ের ঘর থেকে গন্ধ বেরচ্ছে। এ দিকে বড়ো জ্যাঠামশায় তো এই-সব শুনে তক্ষুনি জানলা দিয়ে পাইপ-তামাক সব ছুঁড়ে একেবারে বাইরে ফেলে দিলেন। কর্তাদাদামশায় যখন খবর পেলেন, বললেন, দ্বিজেন্দর তামাক খাবেন, তা খা্ন-না, তবে পাইপ-টাইপ কেন। ভালো তামাক আনিয়ে দাও।

কর্তাদাদামশায় মহর্ষি হলে কী হবে— এ দিকে শৌখিন ছিলেন খুব। কোথাও একটু নোংরা সইতে পারতেন না। সব-কিছু পরিষ্কার হওয়া চাই। কিছুদিন বাদে-বাদেই তিনি ব্যবহারের কাপড়-জামা ফেলে দিতেন, চাকররা সেগুলো পরত। কর্তাদাদামশায়ের চাকরদের যা সাজের ঘটা ছিল— একেবারে ধোপ-দোরস্ত সব সাজ।

কর্তাদাদামশায় কখনো এই বৃদ্ধকালেও তোয়ালে দিয়ে গা রগড়াতেন না, চামড়ায় লাগবে। সেজন্য মসলিনের থান আসত, রাখা থাকত আলমারির উপরে, তাই থেকে কেটে কেটে দেওয়া হত, তারই টুকরো দিয়ে তিনি গা রগড়াতেন, চোখ পরিষ্কার করতেন।

চাকররা কত সময়ে সেই মসলিন চুরি করে নিয়ে নিজেদের জামা করত। দীপুদা বলতেন, এই বেটারাই হচ্ছে কর্তাদাদামশায়ের নাতি, কেমন মসলিনের জামা পরে ঘুরে বেড়ায়, আমরা এক টুকরোও মসলিন পাই না— আমরা কর্তাদাদামশায়ের নাতি কী আবার। দেখছিস না চাকর-বেটাদের সাজের বাহার?

ঈশ্বরবাবু গল্প করতেন, একবার কর্তামশায়ের শখ হল, কল্পতরু হব। রব পড়ে গেল বাড়িতে, কর্তাদাদামশায় কল্পতরু হবেন। কল্পতরু আবার কী। কী ব্যাপার। সারা বাড়ির লোক এসে ওঁর সামনে জড়ো হল। উনি বললেন, ঘর থেকে যার যা ইচ্ছে নিয়ে যাও। কেউ নিলে ঘড়ি, কেউ নিলে আয়না, কেউ নিলে টেবিল— যে যা পারলে নিয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে ঘর খালি হয়ে গেল। সবাই চলে গেল। ঈশ্বরবাবু বললেন, বুঝলে ভাই, তোমার কর্তাদাদামশায় তো কল্পতরু হয়ে খালি ঘরে এক বেতের চৌকির উপর বসে রইলেন।

৩

এ তো গেল শোনা গল্প। এইবারে শোনো কর্তাদাদামশায়ের গল্প যা আমাদের আমলের।

তার পর থেকে বরাবর কর্তাদাদামশায় ওই বেতের চৌকিতেই বসতেন। আমরাও দেখেছি তিনি সোজা হয়ে বেতের চৌকিতে বসে আছেন। পায়ের কাছে একটি মোড়া, কখনো কখনো পা রাখতেন তার উপরে। আর পাশে থাকত একটা তেপায়া— তার উপরে একখানি হাফেজের কবিতা, এই বইখানি পড়তে উনি খুব ভালোবাসতেন— আর একখানি ব্রাহ্মধর্ম। কর্তাদাদামশায়ের পাশে একটি ছোটো পিরিচে থাকত কিছু ফুল— কখনো কয়েকটি বেলফুল, কখনো জুঁই, কখনো শিউলি— গোলাপ বা অন্য ফুল নয়— ওই রকমের শুভ্র কয়েকটি ফুল, উনি বলতেন গন্ধপুষ্প।

বড়োপিসিমা রোজ সকালে কিছু ফুল পিরিচে করে তাঁর পাশে রেখে যেতেন। আর থাকত একখানি পরিষ্কার ধোপ-দোরস্ত রুমাল। যখন শরবত বা কিছু খেতেন, খেয়ে ওই রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নীচে ফেলে দিতেন— চাকররা তুলে নিত কাচবার জন্য, আবার আর-একখানা পরিষ্কার রুমাল এনে পাশে রেখে দিত। আমরা যেমন রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আবার পকেটে রেখে দিই, তাঁর তা হবার উপায় ছিল না, ফি বারেই পরিষ্কার রুমাল দিয়ে মুখ মুছতেন। আর থাকত দু পাশে খানকয়েক চেয়ার অভ্যাগতদের জন্য। আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে বা কৌচে বসতে কখনো তাঁকে আমরা দেখি নি, রবিকাকাও বোধ হয় তাঁকে কখনো কৌচে বসতে দেখেন নি। তবে আমি শুধু একবার দেখেছিলুম— সে অনেক আগের কথা, তখন তাঁর প্রৌঢ় অবস্থা, বাইরে বাইরেই বেশি ঘুরতেন, মাঝে মাঝে যখন আসতেন তখন দক্ষিণ দিকের ওই পাশের দোতলায়ই তিনি থাকতেন। আমাদের এ পাশের পুবের জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখা সাহসে কুলোত না, শরীরের মাপও খড়খড়ি ছাড়িয়ে মাথা উঠত না, একদিন জানালার খড়-খড়ির ভিতর দিয়ে দেখি— খাওয়াদাওয়ার পর কর্তাদাদামশায় বসেছেন কৌচে— হরকরা কিনুসিং এসে গড়গড়া দিয়ে গেল। কর্তাদাদামশায়ের তখন কালো দাড়ি গালের দু পাশ দিয়ে তোলা। মসলিনের জামার ভিতর দিয়ে গায়ের গোলাপী আভা ফুটে বেরুচ্ছে। মস্ত একটি আলবোলা, টানলেই তার বুল্‌বুল্ বুল্‌বুল্ শব্দ আমরা এ বাড়ি থেকেও শুনতে পেতুম। ওই একবার আমি দেখেছিলুম ওঁকে কৌচে-বসা অবস্থায়।

একটা ছবি ছিল তাঁর, বোধ হয় এখনো আছে রথীর কাছে— কালো দাড়ি ওই ছবিতে ছিল, গায়ে বেশ দামি শাল, তখনকার কথা অন্য রকম। এই দাড়ির আবার মজার গল্প আছে, এই গল্প ঈশ্বরবাবুর কাছে শুনেছি আমরা। ঈশ্বরবাবু বলতেন, জানো

ভাই, কর্তামশায়ের দাড়ির ইতিহাস? জানো কোত্থেকে এই দাড়ির উৎপত্তি? এই, এই আমি, আমার দেখাদেখি কর্তামশায় দাড়ি রাখলেন।

সে কী রকম।

তোমার দাদামশায় নববাবুবিলাস যাত্রা করাবেন, বাড়ির আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নামতে হবে সেই যাত্রাতে— সবাই কিছু-না-কিছু সাজবে। আমাকে বললেন, ঈশ্বর, তোমাকে দরোয়ান সাজতে হবে। পরচুলো-টুলো নয়, আসল গোঁফ-দাড়ি গজাও।

তখন দাড়ি রাখার কোনো ফ্যাশান ছিল না, সবাই গোঁফ রাখতেন কিন্তু দাড়ি কামিয়ে ফেলতেন। আর সত্যিও তাই— পুরানো আমলের সব ছবি দেখো কারো দাড়ি নেই, সবার দাড়ি কামানো। কর্তাদাদামশায়েরও দাড়ি-কামানো ছবি আছে। আমি বর্ধমানে রাজার বাড়িতে দেখেছি। বর্ধমানের রাজা তাঁকে গুরু বলতেন। তারও একটা গল্প আছে— এও আমাদের ঈশ্বরবাবুর কাছে শোনা। একবার বর্ধমানের রাজা এসেছেন এখানে গুরুকে প্রণাম করতে। তখনকার দিনে বর্ধমানের রাজা আসা মানে প্রায় লাটসাহেব আসার মতো, সোরগোল পড়ে যেত। রাজাকে দেখবার জন্য রাস্তার দু ধারে লোক জমে গেছে, আশেপাশের মেয়েরা ছাদে উঠেছে। এখন রাজাকে নিয়ে তিন ভাই, কর্তা-দাদামশায়, আমার দাদামশায় আর ছোটোদাদামশায় তেতলার ছাদে এ ধারে ও ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঈশ্বরবাবু বলতেন— তা, আমরা তো নীচে ঘোরাঘুরি করছি— শুনি সবাই বলাবলি করছে— এঁদের মধ্যে রাজা কোন্‌টি। এই বলে তারা তোমার ওই তিন দাদামশায়কে ঘুরে ফিরে দেখিয়ে দিচ্ছে— কেউ বলছে এটা রাজা, কেউ বলছে ওইটাই রাজা।

ঈশ্বরবাবু বলতেন, তার পর জানো ভাই, আমি তো দাড়ি গজাতে শুরু করলুম, মাঝখানে সিঁথি কেটে দাড়ি ভাগ করে

গালের ছু দিক দিয়ে কানের পাশ অবধি তুলে দিই। সেই আমার দেখাদেখি কর্তামশায় দাড়ি রাখলেন। কর্তামশায়ের যেই-না দাড়ি রাখা, কী বলব ভাই, দেখতে দেখতে সবাই দাড়ি রাখতে শুরু করলে, আর কর্তামশায়ের মতো সোনার চশমা ধরল। সেই থেকে দাড়ি আর সোনার চশমার একটা চাল শুরু হয়ে গেল। শেষে ছোকরারা পর্যন্ত দাড়ি আর চশমা ধরলে। এবারে বুঝলে তো ভাই কোত্থেকে এই দাড়ির উৎপত্তি? এই বলে ঈশ্বরবাবু খুব গর্বের সঙ্গে বুকে হাত দিয়ে নিজেকে দেখাতেন।

কর্তাদাদামশায়ের সব-প্রথম চেহারা আমার মনে পড়ে আমার অতি বাল্যকালে দেখা। ছু বাড়ির মাঝখানে যে লোহার ফটকটি, সকালবেলা একলা-একলা সেই ফটকটির লোহার গরাদে গা ঢুকিয়ে একবার ঠেলে এ দিকে আনছি, একবার ঠেলে ওই দিকে নিচ্ছি, এইভাবে গাড়ি-গাড়ি খেলা করছিলুম। সেই সময়ে কর্তাদাদামশায় এলেন, একখানি ফার্স্ট ক্লাস ঠিকেগাড়িতে। উনি যখন আসতেন কাউকে খবর দিতেন না, ওই রকম হঠাৎ এসে পড়তেন। সকালবেলা বাড়ির সবাই তখনো ঘুমোচ্ছে। এর আগে আমরা তাঁকে কখনো দেখি নি। গাড়ির উপরে কিশোরী বসে, কিশোরী পাঁচালি পড়তেন, নেমে দরজা খুলে দিলে কর্তাদাদামশায় গাড়ি থেকে নামলেন। লম্বা পুরুষ, সাদা বেশ। বাড়িতে সাড়া পড়ে গেল, সবাই তটস্থ, আমার গাড়ি-গাড়ি খেলা বন্ধ হয়ে গেল— ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে লাগলুম, দরোয়ানদের সঙ্গে। বাড়ির সরকার কর্মচারী সবাই এসে তাঁকে পেন্নাম করছে, আমার কী খেয়াল হল, আমিও সেই ধুলোকাদামাখা জামা-কাপড়েই ছুটে গিয়ে পায়ে এক পেন্নাম। কর্তাদাদামশায় আমার মাথায় ছু-তিনবার হাত চাপড়া দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তার পরে আমি তো এক দৌড়ে একেবারে মার কাছে চলে এলুম। মা শুনে তো আমাকে বকতে লাগলেন—অ্যাঁ, তুই কোন্ সাহসে গেলি, এই রকম বেশে

ধুলোকাদা মেখে! চাকরও দাবড়ানি দেয়, ভাবলুম কী একটা অন্যায় করে ফেলেছি। এই তাঁর প্রথম মূর্তি আমার মানসপটে। আর-একবার আরো কাছ থেকে তাঁকে দেখেছি, দিনুর অন্নপ্রাশন কি পইতে উপলক্ষে। লাল চেলির জোড় পরা আচার্যবেশে দালানে নেমে গিয়ে মন্ত্র পাঠ করছেন, যেমন ১১ই মাঘে আগে করতেন। এই তিন চেহারা তাঁর, আর-এক চেহারা দেখেছি একেবারে শেষকালে।

ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণার একটি গল্প আছে। শৌখিন হলেই যে ঐশ্বর্যের উপর মমতা বা লোভ থাকে তা নয়। শৌখিনতা হচ্ছে ভিতরের শখ থেকে। কর্তাদাদামশায়ের সেই গল্পই একটি বলি শোনো। শ'বাজারের রাজবাড়িতে জলসা হবে, বিরাট আয়োজন। শহরের অর্ধেক লোক জমা হবে সেখানে; যত বড়ো বড়ো লোক, রাজ-রাজড়া, সকলের নেমন্তন্ন হয়েছে। তখন কর্তাদাদামশায়দের বিষয়সম্পত্তির অবস্থা খারাপ— ওই যে-সময়ে উনি পিতৃঋণের জন্য সব-কিছু ছেড়ে দেন তার কিছুকাল পরের কথা। শহরময় গুজব রটল, বড়ো বড়ো লোকেরা বলতে লাগলেন —দেখা যাক এবারে উনি কী সাজে আসেন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। বাড়ির কর্মচারিরাও ভাবছে, তাই তো! গুজবটি বোধ হয় কর্তাদাদামশায়ের কানেও এসেছিল। তিনি করমচাঁদ জহুরীকে বৈঠকখানায় ডাকিয়ে আনালেন বিশ্বেস দেওয়ানকে দিয়ে। করমচাঁদ জহুরী সেকালের খুব পুরোনো জহুরী, এ বাড়ির পছন্দ-মাফিক সব অলংকারাদি করে দিত বরাবর। কর্তাদাদামশায় তাকে বললেন, একজোড়া মখমলের জুতোয় মুক্তো দিয়ে কাজ করে আনতে। তখনকার দিনে মখমলের জুতো তৈরি করিয়ে আনতে হত। করমচাঁদ জহুরী তো একজোড়া মখমলের জুতো ছোটো ছোটো দানা দানা মুক্তো দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তৈরি করে এনে দিলে। এখন জামা-কাপড়— কী রকম সাজ হবে। সরকার দেওয়ান সবাই ভাবছে শাল-দোশালা বের করবে, না সিল্কের

জোব্বা, না কী। কর্তাদাদামশায় হুকুম দিলেন— ও-সব কিছু নয়, আমি সাদা কাপড়ে যাব। তখনকার দিনে কাটা কাপড়ে মজলিসে যেতে হত, ধুতি-চাদরে চলত না। জলসার দিন কর্তা-দাদামশায় সাদা আচকান জোড়া পরলেন, মায় মাথার মোড়াসা পাগড়িটি অবধি সাদা, কোথাও জরি-কিংখাবের নামগন্ধ নেই। আগাগোড়া ধব্‌ধব্‌ করছে বেশ, পায়ে কেবল সেই মুক্তো-বসানো মখমলের জুতোজোড়াটি। সভাস্থলে সবাই জরিজরা-কিংখাবের রঙচঙে পোশাক প'রে হীরেমোতি যে যতখানি পারে ধনরত্ন গলায় ঝুলিয়ে, আসর জমিয়ে বসে আছেন— মনে মনে ভাবখানা ছিল, দেখা যাবে দ্বারকানাথের ছেলে কী সাজে আসেন। সভাস্থল গম্‌গম্‌ করছে, এমন সময়ে কর্তাদাদামশায়ের সেখানে প্রবেশ। সভাস্থল নিস্তব্ধ, কর্তাদাদামশায় বসলেন একটা কৌচে পা-দুখানি একটু বের করে দিয়ে। কারো মুখে কথাটি নেই। শ'বাজারের রাজা ছিলেন কর্তাদাদামশায়ের বন্ধু, তাঁর মনেও একটু যে ভয় ছিল না তা নয়। তিনি তখন সভার ছেলে-ছোকরাদের কর্তাদাদা-মশায়ের পায়ের দিকে ইশারা করে বললেন, দেখ্‌ তোরা দেখ্‌, একবার চেয়ে দেখ্‌ এ দিকে, একেই বলে বড়োলোক। আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি ইনি তা পায়ে রেখেছেন।

কর্তাদাদামশায় খুব হিসেবী লোক ছিলেন। মহর্ষিদেব হয়েছেন বলে বিষয়সম্পত্তি দেখবেন না তা নয়। তিনি শেষ পর্যন্ত নিজে সব হিসেবনিকেশ নিতেন। রোজ তাঁকে সব রকমের হিসেব দেওয়া হত। কর্তাদাদামশায় নিজে আমাদের বলেছেন যে তাঁকে রীতিমত দপ্তরখানায় বসে জমিদারির কাজ সব শিখতে হয়েছে। তিনি যে কতবড়ো হিসেবী লোক ছিলেন তার একটি গল্প বলি, তা হলেই বুঝতে পারবে। একবার যখন উনি শিমলে পাহাড়ে, বাড়িতে কোনো মেয়ের বিবাহ। উনি শিমলেয় বসে চিঠি লিখে সব বিধিব্যবস্থা দিচ্ছেন। সেই চিঠি আমরাও দেখেছি।

তাতে না লেখা ছিল এমন বিষয় ছিল না। কোথায় চাঁদোয়া টাঙাতে হবে, কোথায় অতিথি-অভ্যাগতদের বসবার জায়গা করা হবে, কোথায় লোকজনের খাওয়াদাওয়া হবে, দালানের কোন্ জায়গায় বিয়ের আসর হবে, কোন্ দিকে মুখ করে বর কনে বসবে, পাশে সপ্তপদীর সাতখানা আসন কী ভাবে পাতা হবে, অমুক বরকে আসরে আনবে, অমুক কনেকে আসরে আনবে—খুঁটিনাটি কিছুই বাদ ছিল না। নিখুঁতভাবে সব ব্যবস্থা লিখে দিয়েছেন, এত সব লিখে শেষটায় আবার লিখেছেন যে সপ্তপদী-গমনের পর ওই সাতখানা আসন মছনদ ও ঝাড় দুটো বিবাহ-অনুষ্ঠানের পর বাড়ির ভিতরে যাবে। বাসরে সে-সব সাজিয়ে দেওয়া হবে, বর কনে তার উপর বসবে।

কর্তাদাদামশায় লোকদের খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন, আর বিশেষ করে তাঁর ঝোঁক ছিল পায়েসের উপর। ছোটোপিসেমশায়ের কাছে গল্প শুনেছি, তিনি বলতেন কর্তামশায়ের সামনে বসে খাওয়া সে এক বিপদ। প্রথমত কিছু তো ফেলবার জো নেই—অপর্যাপ্ত পরিবেশন করা হবে, সব তো পরিষ্কার করে খেতে হবে। সে তো কোনোরকমে সারা হত, কিন্তু তার পরে যখন পায়েস আসত তখনই বিপদ। পায়েস বাদ দিলে চলবে না, পায়েস খেতেই হবে, নইলে খাওয়া শেষ হল কী। এই পায়েসেরও আবার একটা মজার গল্প আছে, এও আমার ছোটোপিসেমশায়ের কাছে শোনা।

প্রথম দলে যাঁরা ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁদের সবাইকে কর্তাদাদামশায় ওঁ-লেখা মাঝে-রুবি-দেওয়া একটি করে আংটি দিয়েছিলেন। ছোটোপিসেমশায় ছিলেন প্রথম দলের। তিনি প্রায়ই আমাদের সে গল্প বলে বলতেন, জানিস আমি আংটি-পরা ব্রাহ্ম। কর্তাদাদামশায় তখনকার দিনে নিয়ম করে এই দলকে নিয়ে বাগানে যেতেন। সেখানে সকালে স্নান করে উপাসনাদি হত। বামুন-চাকর সঙ্গে যেত, গাছতলায় উনুন খুঁড়ে

রান্নাবান্না হত। কেউ কেউ শখ করে নিজেরাও রাঁধতেন। এই-ভাবে সারা দিন কাটিয়ে আসতেন। এ একেবারে নিয়ম-বাঁধা ছিল। প্রায়ই তাঁরা আমাদের চাঁপদানির বাগানে যেতেন। সেবারেও কর্তাদাদামশায় দলবল নিয়ে গেছেন চাঁপদানির বাগানে। সকালে উপাসনাদি হবার পর রান্নার আয়োজন চলছে। কর্তাদাদামশায় বললেন, পায়েসটা আমি রান্না করব; আমি পায়সান্ন পরিবেশন করে খাওয়াব সবাইকে।

ঘড়া ঘড়া দুধ, থালাভরা মিষ্টি এল। কর্তাদাদা তো পায়েস রান্না করলেন। সবাই খেতে বসেছেন, সব খাওয়া হয়ে গেছে, পায়েস পরিবেশন করা হল। কর্তাদাদামশায়কেও পায়েস দেওয়া হয়েছে। এখন, সবাই একটু পায়েস মুখে দিয়েই হাত গোটালেন, মুখে আর তেমন তোলেন না। কর্তাদাদামশায় সামনে, কেউ কিছু বলতেও পারেন না। মাঝে মাঝে পায়েস একটু একটু মুখেও তুলতে হয়। কর্তাদাদামশায় জিজ্ঞেস করলেন, কী, কেমন হয়েছে পায়েস, ভালো হয়েছে তো?

সবাই ঘাড় নাড়লেন, পায়েস চমৎকার হয়েছে।

তাঁদেরই মধ্যে কে একজন বলে ফেললেন, আজ্ঞে, ভালোই হয়েছে, তবে একটু ধোঁয়ার গন্ধ।

কর্তাদাদামশায় বললেন, ধোঁয়ার গন্ধ হয়েছে তো? ওইটিই আমি চাইছিলুম, আমি আবার পায়েসে একটু ধোঁয়াটে গন্ধ পছন্দ করি কিনা।

পায়েসটা কিন্তু আসলে রান্না করবার সময় ধরে গিয়েছিল। কর্তাদাদামশায় এই রকম তামাশাও করতেন মাঝে মাঝে। রবি-কাকারও এই রকম তামাশা করবার অনেক গল্প আছে।

কর্তাদাদামশায় নিজেও দুধ ক্ষীর পায়েস এই-সব খেতে বরাবরই ভালোবাসতেন। শেষ দিকেও দেখেছি, বড়ো একটা কাঁচের বাটি ছিল সেটা ভরতি তিনি ঘন জ্বাল-দেওয়া দুধ খেতেন রোজ।

একদিন কী করে বাটিটা ভেঙে যায়। বড়োপিসিমা তখন তাঁর সেবা করতেন, তিনি বাজার থেকে যত রকমের কাঁচের বাটিই আনান, কর্তাদাদামশায়ের পছন্দ আর হয় না। ঠিক তেমনটি আর পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। কোনোটা হয় বড়ো, কোনোটা হয় ছোটো। ঠিক সেই মাপের চাই। আবার পাতলা কাঁচের হলেও চলবে না। একবার কর্তাদাদামশায়ের শরবত খাবার কাঁচের গ্লাসটি ভেঙে যায়। দীপুদা শখ করে সাহেবি দোকান অস্লার কোম্পানি থেকে পাতলা কাঁচের গ্লাস এক ডজন কিনে আনলেন কর্তাদাদামশায়ের শরবত খাবার জন্য। কর্তাদাদামশায় বললেন, এ কী গ্লাস! শরবৎ খাবার সময়ে আমার দাঁত লেগেই যে ভেঙে যাবে। সে গ্লাস চলল না— দীপুদাই বকশিশ পেলেন। তার পর বোম্বাই থেকে চার দিকে গোল-গোল পল-তোলা পুরু বোম্বাই গ্লাস এল, তবে কর্তাদাদামশায় তাতে শরবৎ খেয়ে খুশি। বড়ো-পিসিমা একদিন আমাকে বললেন, অবন, তুই তো নানা জায়গায় ঘুরিস, দেখিস তো, কোথাও যদি ওরকম একটি বাটি পাস বাবামশায়ের দুধ খাবার জন্য। একদিন গেলুম আমার জানাশোনা কয়েকটি লোক নিয়ে মুর্গিহাটায়। ভাবলুম বিলিতি জিনিস তো কর্তাদাদামশায়ের পছন্দ হবে না, দেশীও তেমন ভালো নেই— মুর্গিহাটায় গিয়ে খোঁজ করলুম পার্শিয়ান কাঁচের বাটি আছে কি না। ভাবলুম, ওরকম জিনিস কর্তাদাদামশায়ের পছন্দ হতে পারে। বেশ নতুন ধরনের হবে। সেখানকার লোকেরা বললে, আমাদের কাছে তো সে-সব জিনিস থাকে না। তারা আমাকে নিয়ে গেল চীনেবাজারের গলিতে এক নাখোদা সওদাগরের বাড়িতে। গলির মধ্যে বাড়ি বুঝতেই পার কেমন, ঢুকলুম তার ঘরে। ঢুকে মনে হল যেন আরব্য উপন্যাসের সিন্ধবাদের ঘরে ঢুকলুম, এমনিভাবে ঘর সাজানো। ঘরজোড়া ফরাশ পাতা, ধব্‌ধব্‌ করছে, চার দিকে রেলিং-দেওয়া চওড়া মঞ্চ, তাতে বসে হুঁকো খায়। গড়গড়া ও

নানা রকমের টুকিটাকি জিনিস, খুব যে দামী কিছু তা নয়, কিন্তু কী সুন্দর ভাবে সাজানো সব। লোকটি আদর-অভ্যর্থনা করে ফরাশে নিয়ে বসালে, চা খাওয়ালে। চা টা খাওয়ার পর তাকে বললুম, একটি বেলোয়ারি বড়ো বাটি কর্তার দুধ খাবার জন্য দিতে পার? সে বললে, আজকাল তো সে-সব পুরোনো জিনিস এ দিকে আসে না বড়ো, তবে আমার গুদোমঘরটা একবার দেখাতে পারি, যদি কিছু থাকে। গুদোমঘর খুলে দিলে, যেমন হয়ে থাকে গুদোমঘর, হরেক রকম জিনিসে ঠাসা— তার মধ্যে হঠাৎ নজরে পড়ল একটি বেশ বড়ো পার্শিয়ান ক্রিস্টেলের বাটি, সাদা ক্রিস্টেলের উপর গোলাপী ক্রিস্টেলের ফুলের নকশা। চমৎকার বাটিটা, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলুম। তার আরো দুটো ক্রিস্টেলের জিনিস ছিল, একটা হুঁকো আর একটা গোলাপপাশ, সবুজ রঙ নবদুর্বোর মতো, তার উপরে সোনালি কাজ করা। সব কয়টাই নিয়ে এলুম। ভাবলুম, কর্তাদাদামশায় আর এ-দুটো দিয়ে কী করবেন— তাঁর বাটির কল্যাণে আমারও দুটো জিনিস পাওয়া হবে। বড়ো বাটিটি পিসিমার পছন্দ হল; বললেন, এইবার বোধ হয় ঠিক পছন্দ করবেন, কাল খবর পাবে। পরদিন তাই হল, বাটিটি পেয়ে কর্তাদাদামশায় খুব খুশি, আর বললেন— এ হুঁকো আর গোলাপপাশ আমার দরকার নেই, তুমিই নাও গে। বড়ো চমৎকার জিনিস দুটো, অনেকদিন ছিল আমার কাছেই। তা, ওই বাটিটিতে উনি শেষকাল পর্যন্ত রোজ দুধ খেতেন। তিনি আমাদের মতো বাটির কানা এক হাতে ধরে দুধ খেতেন না। বড়োপিসিমা দুধের বাটি নিয়ে এলেই অঞ্জলি পেতে দু হাতের মধ্যে বাটিটি নিয়ে মুখে তুলে দুগ্ধ পান করতেন। বাটির নীচে একটা ন্যাপকিন দেওয়া থাকত— যাতে হাতে গরম না লাগে। যখন মেয়ের কাছ থেকে অঞ্জলি পেতে বাটিটি নিতেন কী সুন্দর শোভা হত। তাঁর হাত দুখানিও ছিল বেশ বড়ো বড়ো; তাই হাতের মাপসই বাটি নইলে তাঁর

ভালো লাগত না। কর্তাদাদামশায়ের গোরু রোজ গুড় খেত। বড়োপিসিমার উপরেই এই ভার ছিল, রোজ তিনি গোরুকে গুড় খাওয়াতেন। গোরু গুড় খেলে কী হবে? গোরুর দুধ মিষ্টি হবে। দীপুদা বলতেন, দেখছিস কাণ্ড, আমরা গুড় খেতে পাই নে একটু লুচির সঙ্গে, আর কর্তাদাদামশায়ের গোরু দিব্যি কেমন রোজ গাদা গাদা গুড় খাচ্ছে। আমি নাতি হয়ে জন্মেও কিছুই করতে পারলুম না। দীপুদার কথা ছিল সব এমনিই, বেশ রসালো করে কথা বলতেন।

কর্তাদাদামশায় এ দিকে আবার পিটপিটেও ছিলেন খুব। একবার তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে, সাহেব ডাক্তার এসেছেন দেখতে, ডাক্তার সণ্ডার্স, তিনি আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার। ডাক্তার এসে তো দেখে শুনে গেলেন। যাবার সময়ে কর্তাদাদামশায়ের সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করে গেলেন যেমন যান বরাবর। কর্তাদাদামশায়ও 'থ্যাঙ্ক্‌ ইউ ডাক্তার' ব'লে হাত বাড়িয়ে দিলেন। এ হচ্ছে দস্তুর, ভদ্রতা, এ বাদ যাবার জো নেই। ডাক্তারও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমরা দেখি কর্তাদাদামশায়ের হাত আর নামে না। যে হাত দিয়ে শেক্‌হ্যাণ্ড করেছিলেন সেই হাতখানি টান করে বাইরে ধরে আছেন হাতের পাঁচটা আঙুল ফাঁক করে। দীপুদা বললেন, হল কী। কর্তাদাদামশায়ের হাত আর নামে না কেন, শক-টক লাগল নাকি। চাকররা জানত, তারা তাড়াতাড়ি ফিংগার-বোলে করে জল এনে কর্তাদাদামশায়ের হাতের কাছে এনে ধরতেই তার মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে ভালো করে ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুছে তবে ঠিক হয়ে বসলেন।

কর্তাদাদামশায়ের কী সুন্দর শরীর আর স্বাস্থ্য ছিল তার একটা গল্প বলি শোনো।

একবার যখন উনি চুঁচড়োর বাগানবাড়িতে হঠাৎ কী যেন ওঁর খুব কঠিন অসুখ হয়। এখানে আনবার সাধ্য নেই এমন অবস্থা।

এবাড়ি থেকে সবাই রোজ যাওয়া-আসা করছেন। ডাক্তার নীলমাধব আরো কে কে কর্তাদাদামশায়ের দেখাশোনা করছেন, চিকিৎসাদি হচ্ছে। হতে হতে একদিন কর্তাদাদামশায়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। এমন খারাপ যে ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়ে নীচের তলায় এসে বসে রইলেন। শেষ অবস্থা, এ বাড়ির বড়োরা সবাই সেখানে— আমরা ছেলেমানুষ, আমাদের যাওয়া বারণ। কর্তা-দাদামশায়ের খাটের চার পাশে সবাই দাঁড়িয়ে। কী করে যেন সে সময়ে আবার কর্তাদাদামশায়ের খাটের মশারিতে আগুন ধরে যায়— বাতি থেকে হবে হয়তো। ন-পিসেমশাই জানকীনাথ সেই মশারি টেনে ছিঁড়ে খুলে ফেলে অন্য মশারি টাঙিয়ে দেন। কর্তা-দাদামশায় তখন অসান অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। সবাই তো দাঁড়িয়ে আছে, আর আশা নেই। এমন সময়ে ভোর-রাত্তিরে, যে সময়ে উনি রোজ উঠে উপাসনা করতেন, কর্তাদাদামশায় এক ঝটকায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন বিছানার উপরে। উঠে বসেই বললেন, শাস্ত্রীকে ডাকো।

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কাছেই ছিলেন, ছুটে সামনে এলেন।

কর্তাদাদামশায় তাঁকে বললেন, ব্রাহ্মধর্ম পড়ো।

সবাই একেবারে থ। শাস্ত্রীমশায় ব্রাহ্মধর্ম পড়তে লাগলেন। কর্তাদাদামশায় সেই সোজা বসে বসেই তা শুনতে লাগলেন, আর সেইসঙ্গে আস্তে আস্তে উপাসনা করতে লাগলেন। সবাই বুঝল এইবারে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। উপাসনার পরে ডাক্তার এসে নাড়ী টিপলেন, নাড়ী চন্‌বন্‌ করে চলছে; কর্তাদাদামশায় একেবারে সহজ অবস্থা লাভ করেছেন। ডাক্তার নীলমাধব নিজে আমাদের বলেছেন, এ রকম করে বেঁচে উঠতে দেখি নি কখনো। সেকাল হলে এ রকম অবস্থায় রুগীকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে দু-তিন আঁজলা জল মুখে দিতে না দিতেই শেষ হয়ে যেত সব। এ যেন মরে গিয়ে ফিরে আসা। পরে কর্তাদাদামশায়ের মুখে আমরা গল্প শুনেছি,

তা বোধ হয় উনি লিখেও গেছেন যে, এক সময়ে ওঁর মনে হল ওঁর উপরে আদেশ হয় 'তোমার কাজ এখনো বাকি আছে'।

সে যাত্রা তো তিনি কাটিয়ে উঠলেন, কিছুকাল বাদে ডাক্তাররা বললেন হাওয়া বদল করতে। কোথায় যাবেন। ওঁর আবার বরাবরের ঝোঁক পাহাড়ে যাবার, ঠিক হল দার্জিলিঙে যাবেন। সব জোগাড়-যন্তোর হতে লাগল। দীপুদা বললেন, আমি একলা পারব না, কর্তাদাদামশায়ের এই শরীর, যাওয়া-আসা, হাঙ্গামা কত, শেষটায় উনি ওখানেই দেহ রাখুন, আমিও দেহ রাখি। ডাক্তার নীলমাধব সঙ্গে গেলেন। আরো দু-চারজন কারা-কারাও সঙ্গে ছিল। দার্জিলিঙে গিয়ে উনি কী খেতেন যদি শোন, দীপুদার কাছে সে গল্প শুনেছি। এই এক দিস্তা হাতে-গড়া রুটি, এক বাটি অড়হড় ডাল, আর একটি বাটিতে গাওয়া ঘি গলানো। সেই রুটি ডালেতে ঘিয়েতে জুবড়ে তিনি মুখে দিতেন। এই তাঁর অভ্যেস। দীপুদা বলতেন, আমি তো ভয়ে ভয়ে মরি ওঁর খাওয়া দেখে, কিন্তু ঠিক হজম করতেন সব। নেমে যখন এলেন কর্তাদাদামশায়, লাল টক্‌টক্ করছে চেহারা, স্বাস্থ্যও চমৎকার। কে বলবে কিছুকাল আগে তিনি মরণাপন্ন অসুখে ভুগেছিলেন। পার্ক স্ট্রীটে একটা খুব বড়ো বাড়ি নেওয়া হয়েছিল, দার্জিলিং থেকে নেমে সোজা সেখানেই উঠলেন। সেই বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। তার পর কী একটা হয়, বাড়িওয়ালা বোধ হয় বাড়িটা অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে দেয়, ভাড়াটে উঠে যাবার জন্য তাগিদ দিতে থাকে, কর্তাদাদামশায় বললেন, আর ভাড়াটে বাড়ি নয়, আমি নিজের বাড়িতেই ফিরে যাব। দীপুদার উপরে ভার পড়ল তাঁর জন্য তেতলার ঘর সাজিয়ে রাখবার। দীপুদা মহা উৎসাহে সাহেবি দোকান থেকে দামী দামী আসবাবপত্র, ভালো ভালো পর্দা ফুলদানি সব আনিয়ে চমৎকার করে তো ঘর সাজালেন। আমাদের ছিল একটা গাড়ি, ভিক্টোরিয়া নাম ছিল সেটার। কোচম্যানটাকে ভালো করে

বুঝিয়ে দেওয়া হল, যেন খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালায়, যেন ঝাঁকুনি না লাগে। ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে দপাস দপাস করে চলতে লাগল— সেই গাড়িতে কর্তাদাদামশায়, সঙ্গে দীপুদা, বড়োজ্যাঠামশায় ছিলেন। কর্তাদাদামশায় এলেন, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মশায়ও ছিলেন কাছে, কাউকে ধরতে ছুঁতে দিলেন না, নিজেই হেঁটে সোজা উপরে উঠে এলেন। এসেই তাঁর প্রথমে নজরে পড়েছে; বললেন, ঢালু বারান্দা, ঢালু বারান্দা আমার কোথায় গেল, এই যে ঘরের সামনে ছিল। ভূমিকম্পে ফেটে গিয়েছিল দু-এক জায়গা, রবিকাকা ভয়ে সে বারান্দা নামিয়ে ফেলেছিলেন। কর্তাদাদামশায় বললেন, পশ্চিমের রোদ্‌দুর আসবে যে ঘরে, পর্দা টাঙিয়ে দাও। বড়ো বড়ো ক্যান্‌ভাস জাহাজের ডেকের মতো ঘরের সামনে টাঙানো হল। দেখতে লাগল যেন মস্ত একটা শিবির পড়েছে তেতলার উপরে। ঘরে ঢুকলেন, ঢুকে— জানলায় দরজায় ছিল দামী দামী বাহারের কার্টেন ঝোলানো— ধরে এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, এ-সব নেটের পর্দা ঝুলিয়েছ কেন ঘরে, মশারি-মশারি মনে হচ্ছে। সারা ঘরে এই-সব ঝুলিয়েছ, ঘরে মশা-ফশা হবে, ব'লে দু-একটা পর্দা পটাপট ছিঁড়তেই দীপুদা তাড়াতাড়ি সব পর্দা খুলে বগলদাবা করলেন। তার পর কর্তা-দাদামশায় ঘরের চার দিকে দেখে বললেন, এ-সব কী— এ-সব তুমি নিয়ে গিয়ে তোমাদের বৈঠকখানায় সাজাও, এ-সব আসবাবের আমার দরকার নেই। রাখলেন শুধু একটা ছবিতে আঁকা গির্জের মধ্যে ঘড়ি, টং টং করে বাজত, বড়ো একটা চৌকো ছবির মতো ব্যাপার। সেইটি রইল ঘরে আর রইল তাঁর সেই নিত্য-ব্যবহারের বেতের চৌকি ও মোড়া। আর তেতলার ছাদের উপর সারি সারি মাটির কলসী উপুড় করিয়ে রাখা হল ছাদের তাত নিবারণের জন্য। দীপুদা আর কী করেন; বললেন, ভালোই হল, মাঝ থেকে আমার কতকগুলো ভালো ভালো জিনিস হয়ে গেল। তিনি ভালো করে

সে-সব জিনিসপত্তোর দিয়ে বৈঠকখানা সাজালেন। দীপুদা ভারি খুশি, প্রায়ই আমাদের সে-সব আসবাবপত্র দেখিয়ে বলতেন, কর্তাদাদামশায়ের দেওয়া এ-সব।

কর্তাদাদামশায় শেষদিন পর্যন্ত ওই ঘরেই ছিলেন। বড়োপিসিমা তাঁর সেবা করতেন। তিনি জানতেন কর্তাদাদামশায়ের পছন্দ-অপছন্দ। আহা, বেচারি বড়োপিসিমা, বিধবা ছিলেন তিনি, কী নিখুঁত সেবা, আর কী ভালোবাসা বাপের জন্য— অমন আর দেখা যায় না। সে সময়ে আমি কর্তাদাদামশায়ের কয়েকটি ছবি এঁকেছিলুম। শশী হেস ইটালি থেকে আর্টিস্ট হয়ে এলেন, তিনিও কর্তাদাদামশায়ের ছবি আঁকলেন। তার পর অনেক দিন কাটল, অনেক কাণ্ডই হল। কর্তাদাদামশায় আছেন উপরের ঘরেই। সারা বাড়ি যেন গম্‌গম্‌ করছে, এমনিই ছিল তাঁর প্রভাব। এখন যেমন বাড়িতে রবিকাকা থাকলে চার দিক তাঁর প্রভাবে সরগরম হয়ে ওঠে, চার দিকে একটা অভয়, আলো ছড়ায়, তেমনি কর্তাদাদামশায়েরও চার দিকে যেন দব্‌দপা ছড়াত।

কর্তাদাদামশায়ের চতুর্থ রূপ যা আমার মনে ছাপ রেখে গেছে, আর এই হল তাঁর শেষ চেহারা। কয় দিন থেকে কর্তাদাদামশায়ের শরীর খারাপ, বাঁ দিকের পাঁজরার নীচে একটু-একটু ব্যথা। সোজা হয়ে বসতে পারেন না— বাঁ দিকে কাত হয়ে বসতে হয়। ডাক্তাররা বললেন, একটা অ্যাব্‌সেস ফর্ম করেছে, অপারেশন করতে হবে। দীপুদা ইন্‌ভ্যালিড চেয়ার, প্রকাণ্ড ইন্‌ভ্যালিড কৌচ, কিনে নিয়ে এলেন সাহেবি দোকান থেকে। কৌচটা চামড়া দিয়ে মোড়া, এক হাত উঁচু গদি, সেই কৌচেই কর্তাদাদামশায় মারা যান। তিনি বরাবর দক্ষিণ দিকে পা করে শুতেন। আমাদের আবার বলে, উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুতে নেই, কিন্তু কর্তা-দাদামশায়কে দেখেছি তার উল্টো। দক্ষিণ দিকে পা নিয়ে শুতেন, মুখে হাওয়া লাগবে। দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন, অত বড়ো লম্বা কৌচটিতে

তো টান হয়ে শুতেন— এতখানি হাঁটু অবধি পা বেরিয়ে থাকত কোঁচ ছাড়িয়ে।

অপারেশন হল। ভিতরে কিছুই পাওয়া গেল না; ডাক্তাররা বললেন, কোল্ড অ্যাবসেস। যাই হোক, ডাক্তাররা তো বুকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে চলে গেলেন। কর্তাদাদামশায় রোজ সকালে সূর্যদর্শন করতেন। ঘরের সামনে পুবদিকের ছাদে গিয়ে বসতেন, সূর্যদর্শন করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে পরে ঘরে চলে আসতেন। পরদিন আমরা ভাবলুম, তাঁর বুঝি আজ সূর্যদর্শন হবে না। সকালে উঠে এ বাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি মারছি; দেখি ঠিক উঠে আসছেন কর্তাদাদামশায়। রেলিং ধরে নিজেই হেঁটে হেঁটে এলেন, চাকররা পিছন-পিছন চেয়ার নিয়ে এল। কর্তাদাদামশায় সোজা হয়ে বসলেন, সূর্যদর্শন করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে উপাসনা করে নিত্যকার মতো ঘরে চলে গেলেন। এই সূর্যদর্শন কোনোদিন তাঁর বাদ যায় নি। মৃত্যুর আগের দিন অবধি তিনি বাইরে এসে সূর্যদর্শন করেছেন।

সে সময় কর্তাদাদামশায় প্রায়ই বড়োপিসিমাদের বলতেন, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, দেবদূতরা তাঁর কাছে এসেছিলেন। প্রায়ই এ স্বপ্ন তিনি দেখতেন। বড়োপিসিমা ভাবিত হলেন, একদিন আমাকে বললেন, অবন, এ তো বড়ো মুশকিল হল, বাবামশায় প্রায় রোজই স্বপ্ন দেখছেন দেবদূতরা তাঁকে নিতে এসেছিলেন। আমরাও ভাবি, তাই তো, তবে কি এ যাত্রা আর তিনি উঠবেন না।

সেদিন সকাল থেকে পিটির পিটির বৃষ্টি পড়ছে। দীপুদা এসে বললেন, কর্তাদাদামশায়ের অবস্থা আজ খারাপ, কী হয় বলা যায় না; তোমরা তৈরি থেকো। আত্মীয়স্বজন, কর্তাদাদামশায়ের ছেলেমেয়েরা, সবাই খবর পেয়ে যে যেখানে ছিলেন এসে জড়ো হলেন। কর্তাদাদামশায়ের অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে, ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিলেন। আমরা ছেলেরা সবাই বাইরে

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, এক-একবার দরজার ভিতরে উঁকি মেরে দেখছি। কর্তাদাদামশায় স্থির হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা এক-এক করে সামনে যাচ্ছেন। রবিকাকা সামনে গেলেন, বড়োপিসিমা কর্তাদাদামশায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, রবি, রবি এসেছে। তিনি একবার একটু চোখ মেলে হাতের আঙুল্ দিয়ে ইশারা করলেন রবিকাকাকে পাশে বসতে। কর্তাদাদামশায়ের কৌচের ডান পাশে একটা জলচৌকি ছিল, রবিকাকা সেটিতে বসলে কর্তাদাদামশায় মাথাটি যেন একটু হেলিয়ে দিলেন রবিকাকার দিকে, ডান কানে যেন কিছু শুনতে চান এমনি ভাব। বড়োপিসিমা বুঝতে পারতেন; তিনি বললেন, আজ সকালে উপাসনা হয় নি, বোধ হয় তাই শুনতে চাচ্ছেন, তুমি ব্রাহ্মধর্ম পড়ো। রবিকাকা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে পড়তে লাগলেন—

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

রবিকাকা যত পড়েন কর্তাদাদামশায় আরো তাঁর কান এগিয়ে দিতে থাকলেন। এমনি করে খানিক বাদে মাথা আবার আস্তে আস্তে সরিয়ে নিলেন; ভাবটা যেন, হল এবারে। বড়োপিসিমা বাটিতে করে দুধ নিয়ে এলেন, তখনো তাঁর ধারণা খাইয়ে-দাইয়ে বাপকে সুস্থ করে তুলবেন। অতি কষ্টে এক চামচ দুধ খাওয়াতে পারলেন। তার পর আর কর্তাদাদামশায়ের কোনো পরিবর্তন নেই, স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইলেন, বাইরের দিকে স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে। এইভাবে কিছুকাল থাকবার পর দু-তিন বার বলে উঠলেন,

বাতাস! বাতাস! বড়োপিসিমা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করছিলেন, তিনি আরো জোরে হাওয়া করতে লাগলেন। কর্তাদাদামশায় ওই কথাই থেকে থেকে বলতে লাগলেন, বাতাস! বাতাস!

আমরা সবাই বারান্দা থেকে দেখছি। দীপুদা আগেই সরে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি আর দেখতে পারব না। কর্তাদাদামশায় 'বাতাস বাতাস' বলতে বলতেই এক সময়ে বলে উঠলেন, আমি বাড়ি যাব। যেই-না এ কথা বলা, বড়োপিসিমার হু চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। বুঝি-বা এইবারে সত্যিই তাঁর বাড়ি যাবার সময় হয়ে এল। থেকে থেকে কর্তাদাদামশায় ওই কথাই বলতে লাগলেন। সে কী সুর, যেন মার কাছে ছেলে আবদার করছে 'আমি বাড়ি যাব'। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর; ঘড়িতে টং টং করে ঠিক যখন বারোটা বাজল সঙ্গে সঙ্গে কর্তাদাদামশায়ের শেষ নিশ্বাস পড়ল। যেন সত্যিই মা এসে তাঁকে তুলে নিয়ে গেলেন। একটু শ্বাসকষ্ট না, একটু বিকৃতি না, দক্ষিণ মুখে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন ঘুমিয়ে পড়লেন।

খবর পেয়ে দেখতে দেখতে শহরসুদ্ধ লোক জড়ো হল। শ্মশানে নিয়ে যাবার তোড়জোড় হতে লাগল। এই-সব হতে হতে তিনটে বাজল। ততক্ষণে কর্তাদাদামশায়ের দেহ হয়ে গেছে যেন চন্দনকাঠের সার। তখন ওই একটিই পুরোনো ঘোরানো সিঁড়ি ছিল উপরে উঠবার। আমরা বাড়ির ছেলেরা সবাই মিলে তাঁর দেহ ধরাধরি করে তো অতিকষ্টে সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামালুম। সাদা ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল চার দিক। সেই ফুলে সাজিয়ে আমরা তাঁর দেহ নিয়ে চললুম শ্মশানে, রাস্তায় ফুল আবীর ছড়াতে ছড়াতে। রাস্তার হু ধারে লোক ভেঙে পড়েছিল। আস্তে আস্তে চলতে লাগলুম। দীপুদা ঠিক করলেন, নিমতলার শ্মশানঘাট ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় গঙ্গার পাড়ে কর্তাদাদামশায়ের

দেহ দাহ করা হবে। এ পারে চিতে সাজানো হল চন্দন কাঠ দিয়ে, ও পারে সূর্যাস্ত, আকাশ সেদিন কী রকম লাল হয়েছিল— যেন সিঁদুরগোলা।

রবিকাকারা মুখাগ্নি করলেন, চিতে জ্বলে উঠল। একটু ধোঁয়া না, কিছু না, পরিষ্কার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল, বাতাসে চন্দনের সৌরভ ছড়িয়ে গেল। কী বলব তোমাকে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ অবধি কর্তাদাদামশায়ের চেহারা, লম্বা শুয়ে আছেন, ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন লক্‌লকে আগুনের শিখাগুলি তাঁকে স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছে। তাঁর চার দিকে সেই আগুনের শিখা যেন ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়াতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই শিখা উপরে উঠতে উঠতে এক সময়ে দপ্ করে নিবে গেল, এক নিশ্বাসে সব-কিছু মুছে নিলে। ও পারে সূর্য তখন অস্ত গেল।

৪

সেকালের কর্তাদের গল্প শুনলে, এবারে দিদিমাদের গল্প কিছু শোনো।

আমার নিজের দিদিমা, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার, নাম যোগমায়া, তাঁকে আমি চোখে দেখি নি। তাঁর গল্প শুনেছি— মা, বড়োপিসিমা, ছোটোপিসিমা— কাদম্বিনী, কুমুদিনীর কাছে। বড়োপিসিমা বলতেন, আমার মার মতো অমন রূপসী সচরাচর আর দেখা যায় না। কী রঙ, যাকে বলে সোনার বর্ণ। মা জল খেতেন, গলা দিয়ে জল নামত স্পষ্ট যেন দেখা যেত; পাশ দিয়ে চলে গেলে গা দিয়ে যেন পদ্মগন্ধ ছড়াত। দিদিমার কিছু গয়না আমার কাছে আছে এখনো, সিঁথি, হীরেমুক্তো-দেওয়া কানঝাপটা। মা পেয়েছিলেন দিদিমার কাছ থেকে। দিদিমার একটি সাতনরী হার ছিল, কী সুন্দর, দুগ্‌গো-প্রতিমার গলায় যেমন থাকে সেই

ধরনের। মা সেটিকে মাঝে মাঝে সিন্দুক থেকে বের করে আমাদের দেখাতেন; বলতেন, দেখ্, আমার শাশুড়ির খোস্‌বো শুঁকে দেখ্।

আমরা হাতে নিয়ে শুঁকে শুঁকে দেখতুম, সত্যিই আতর-চন্দনের এমন একটা সুগন্ধ ছিল তাতে। তখনো খোস্‌বো ভুরভুর করছে, সাতনরী হারের সঙ্গে যেন মিশে আছে। সেকালে আতর মাখবার খুব রেওয়াজ ছিল, আর তেমনিই সব আতর। কতকাল তো দিদিমা মারা গেছেন, আমরা তখনো হই নি, এতকাল বাদে তখনো দিদিমায়ের খোস্‌বো তাঁর হারের সোনার ফুলের মধ্যে পেতুম। সেই হারটি মা সুনয়নীকে দিয়েছিলেন। ছোটো-পিসিমার বিয়ে দিয়েই দিদিমা মারা যান।

একবার দিদিমার অসুখ হয়। তখন দু-জন ফ্যামিলি ডাক্তার ছিলেন আমাদের। একজন বাঙালি, নামজাদা ডি. গুপ্ত; আর-একজন ইংরেজ, বেলী সাহেব। এই দু-জন বরাদ্দ ছিল, বাড়িতে কারো অসুখ-বিসুখ হলে তাঁরাই চিকিৎসাদি করতেন। বেলী সাহেবের তখনকার দিনে ডাক্তার হিসেবে খুব নামডাক ছিল, তার উপরে দ্বারকানাথ ঠাকুর-মশায়ের ফ্যামিলি ডাক্তার তিনি। রাস্তা দিয়ে বেলী সাহেব বের হলেই দু পাশে লোক দাঁড়িয়ে যেত ওষুধের জন্য। তাঁর গাড়িতে সব সময় থাকত একটা ওষুধের বাক্স, গরিবদের তিনি অমনিই দেখতেন, ওষুধ বিতরণ করতে করতে রাস্তা চলতেন। তা দিদিমার অসুখ, বেলী সাহেব এলেন, সঙ্গে এলেন ডি. গুপ্তও, দিদিমার অসুখটা বুঝিয়ে দেবার জন্য।

দিদিমা বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাছে আনিয়ে দাসীকে দিয়ে মাছ তরকারি কাটিয়ে কুটিয়ে দেওয়াতেন, ছেলেদের জন্য রান্না হবে। বেলী সাহেব দাসীকে বাংলায় হাত ধোবার জন্য একটা জলের ঘটি আনতে বললেন। দাসী বেলী সাহেবের আড়বাংলাতে ঘটিকে শুনেছে বঁটি। সে তাড়াতাড়ি মাছকাটা বঁটি নিয়ে এসে

হাজির। বেলী সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, ও মা গো, বঁটি নিয়ে আপনার দাসী এল, আমার গলা কাটবে নাকি!

দাসী তো এক ছুটে পলায়ন, আর বেলী সাহেবের হো-হো করে হাসি। এমনিই তিনি ঘরোয়া ছিলেন।

বেলী সাহেব দিদিমাকে তো ভালো করে পরীক্ষা করলেন। ডি. গুপ্তকে বললেন দিদিমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, তিনি একটু এনিমিক হয়েছেন। বললেন, দোওয়ারীবাবু, মাকে তাঁর অসুখটা বাংলায় ভালো করে বুঝিয়ে দিন।

দোওয়ারীবাবু দিদিমাকে ভালো করে বেলী সাহেবের কথা বাংলায় তর্জমা করে বোঝালেন, 'বেলী সাহেব বলিতেছেন, আপনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছেন।' তিনি 'এনিমিক' এর বাংলা করলেন 'বিরক্ত'।

দিদিমা বললেন, সে কী কথা, উনি হলেন আমাদের এতদিনের ডাক্তার, আমি ওঁর উপরে বিরক্ত কেন হব। সাহেবকে বুঝিয়ে দিন— না না, সে কী কথা, আমি একটুও বিরক্ত হই নি।

দোওয়ারীবাবু যতবার বলছেন 'আপনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছেন' দিদিমা ততই বলেন, আমি একটুও বিরক্ত হই নি। মিছেমিছি কেন বিরক্ত হব, আপনি সাহেবকে বুঝিয়ে দিন ভালো করে।

এই রকম কথাবার্তা হতে হতে বেলী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে, ব্যাপার কী, মা কী বলছেন। জ্যাঠামশায় তখন স্কুলে পড়েন, ইংরেজি বেশ ভালো জানতেন— তিনি বেলী সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন দোওয়ারীবাবু এনিমিকের তর্জমা করছেন— বিরক্ত হইয়াছেন। তাই মা বলছেন যে তিনি একটুও বিরক্ত হন নাই। এই শুনে বেলী সাহেবের হো-হো করে হাসি। জ্যাঠামশায়কে বললেন, মাকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও তিনি একটু রক্তহীন হয়েছেন। বলে, দোওয়ারীবাবুর দিকে কটাক্ষপাত করলেন; বললেন, তুমি বাংলা জানো না দোওয়ারীবাবু? এতক্ষণে সমস্যার মীমাংসা হয়।

এঁড়েদহের বাগানে দিদিমার মৃত্যু হয়। তাঁকে আমরা দেখি নি, ছবিও নেই— শুধু কথায় তিনি আমাদের কাছে আছেন, পুরোনো কথার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে পেয়েছি।

কর্তাদিদিমাকে দেখেছি। তাঁর ছবিও আছে, তোমরাও তাঁর ছবি দেখেছ। ফোটো দিন-দিন ম্লান হয়ে যাচ্ছে এবং যাবে, কিন্তু তাঁর সেই পাকা-চুলে-সিঁদুর-মাখা রূপ এখনো আমার চোখে জ্বলজ্বল করছে, মন থেকে তা মোছবার নয়। তিনি ছিলেন যশোরের মেয়ে, তখন এই বাড়িতে যশোরের মেয়েই বেশির ভাগ আসতেন। তাঁরা সবাই কাছাকাছি বোন সম্পর্কের থাকতেন; তাই তাঁদের নিজেদের মধ্যে বেশ একটা টান ছিল। আমার মা এলেন, শেষ এলেন রথীর মা; ওই শেষ যশোরের মেয়ে এলেন এ বাড়িতে। মা প্রায়ই বলতেন, বেশ হয়েছে, আমাদের যশোরের মেয়ে এল! এই কথা যখন বলতেন তাতে যেন বিশেষ আদর মাখানো থাকত।

কর্তাদিদিমাও রূপসী ছিলেন, কিন্তু ওই ছবি দেখে কে বলবে। ছবিটা যেন কেমন উঠেছে। দীপুদা ওই ছবি দেখে বলতেন, আচ্ছা, কর্তাদাদামশায় কী দেখে কর্তাদিদিমাকে বিয়ে করেছিলেন হে।

তখন ১১ই মাঘে খুব ভোজ হত— পোলাও, মেঠাই। সে কী মেঠাই, যেন এক-একটা কামানের গোলা। খেয়েদেয়ে সবাই আবার মেঠাই পকেটে করে নিয়ে যেত। অনেক লোকজন অতিথি-অভ্যাগতের ভিড় হত সে সময়ে। আমরা ছেলেমানুষ, আমাদের বাইরে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে খাবার নিয়ম ছিল না। বাড়ির ভিতরে একেবারে কর্তাদিদিমার ঘরে নিয়ে যেত আমাদের। সঙ্গে থাকত রামলাল চাকর।

আমার স্পষ্ট মনে আছে কর্তাদিদিমার সে ছবি, ভিতর দিকের তেতলার ঘরটিতে থাকতেন। ঘরে একটি বিছানা, সেকেলে মশারি

সবুজ রঙের, পঙ্খের কাজ করা মেঝে, মেঝেতে কার্পেট পাতা, এক পাশে একটি পিদিম জ্বলছে— বালুচরী শাড়ি প'রে সাদা চুলে লাল সিঁদুর টকটক্ করছে— কর্তাদিদিমা বসে আছেন তক্তপোশে। রামলাল শিখিয়ে দিত, আমরা কর্তাদিদিমাকে পেন্নাম করে পাশে দাঁড়াতুম ; তিনি বলতেন, আয়, বোস্ বোস্।

এতকালের ঘটনা কী করে যে মনে আছে, স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছি, বলো তো ছবি এঁকেও দেখাতে পারি। এত মনে আছে বলেই এখন এত কষ্ট বোধ করি এখনকার সঙ্গে তুলনা করে।

কর্তাদিদিমা রামলালের কাছে সব তন্ন তন্ন করে বাড়ির খবর নিতেন। তিনি ডাকতেন, ও বউমা, ওদের এখানেই আমার সামনে জায়গা করে দিতে বলো।

বউমা হচ্ছেন দীপুদার মা, আমরা বলতুম বড়োমা। সেই ঘরেই এক পাশে আমাদের জন্য ছোটো ছোটো আসন দিয়ে জায়গা হত। কর্তাদিদিমার বড়োবউ, লাল চওড়া পাড়ের শাড়ি পরা— তখনকার দিনে চওড়া লালপেড়ে শাড়িরই চলন ছিল বেশি, মাথায় আধ হাত ঘোমটা টানা, পায় আলতা, বেশ ছোটোখাটো রোগা মানুষটি। কয়েকখানি লুচি, একটু ছোঁকা, কিছু মিষ্টি যেমন ছোটোদের দেওয়া হয় তেমনি দু হাতে দুখানি রেকাবিতে সাজিয়ে নিয়ে এলেন। কর্তাদিদিমা কাছে বসে বলতেন, বউমা, ছেলেদের আরো খানকয়েক লুচি গরম গরম এনে দাও, আরো মিষ্টি দাও। এই রকম সব বলে বলে খাওয়াতেন, বড়োদের মতো আদরযত্ন করে। আমরা খাওয়াদাওয়া করে পায়ের ধুলো নিয়ে চলে আসতুম।

কর্তাদিদিমার একটা মজার গল্প বলি, যা শুনেছি। বড়োজ্যাঠা-মশায়ের বিয়ে হবে। কর্তাদিদিমার শখ হল একটি খাট করাবেন দ্বিজেন্দর আর বউমা শোবে। রাজকিষ্ট মিস্ত্রিকে আমরাও দেখেছি —তাকে কর্তাদিদিমা মৎলব মাফিক সব বাৎলে দিলেন, ঘরেই কাঠকাটরা আনিয়ে পালঙ্ক প্রস্তুত হল। পালঙ্ক তো নয়, প্রকাণ্ড

মঞ্চ। খাটের চার পায়ার উপরে চারটে পরী ফুলদানি ধরে আছে, খাটের ছত্রীর উপরে এক শুকপক্ষী ডানা মেলে। রূপকথা থেকে বর্ণনা নিয়ে করিয়েছিলেন বোধ হয়। ঘরজোড়া প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাঁর মৎলব-মাফিক খাট। কত কল্পনা, নতুন বউটি নিয়ে ছেলে ওই খাটে ঘুমোবে, উপরে থাকবে শুকপক্ষী।

কর্তাদিদিমার এক ভাই জগদীশমামা এখানেই থাকতেন; তিনি বললেন, দিদি, উপরে ওটা কী করিয়েছ, মনে হচ্ছে যেন একটা শকুনি ডানা মেলে বসে আছে।

আর, সত্যিও তাই। শুকপাখিকে কল্পনা করে রাজকিষ্ট মিস্ত্রি একটা কিছু করতে চেষ্টা করেছিল, সেটা হয়ে গেল ঠিক জার্মান ঈগলের মতো, ডানামেলা প্রকাণ্ড এক পাখি।

তা, কর্তাদিদিমা জগদীশমামাকে অমনি তাড়া লাগালেন, যা যা, ও তোরা বুঝবি নে। শকুনি কোথায়, ও তো শুকপক্ষী।

সেই খাট বহুকাল অবধি ছিল, দীপুদাও সেই খাটে ঘুমিয়েছেন। এখন কোথায় যে আছে সেই খাটটি, আগে জানলে দু-একটা পরী পায়ার উপর থেকে খুলে আনতুম।

সাত সাত ছেলে কর্তাদিদিমার; তাঁকে বলা হত রত্নগর্ভা। কর্তাদিদিমার সব ছেলেরাই কী সুন্দর আর কী রঙ। তাঁদের মধ্যে রবিকাকাই হচ্ছেন কালো। কর্তাদিদিমা খুব কষে তাঁকে রূপটান সর ময়দা মাখাতেন। সে কথা রবিকাকাও লিখেছেন তাঁর ছেলে-বেলায়। কর্তাদিদিমা বলতেন, সব ছেলেদের মধ্যে রবিই আমার কালো।

সেই কালো ছেলে দেখো জগৎ আলো করে বসে আছেন।

কর্তাদিদিমা আঙুল মটকে মারা যান। বড়োপিসিমার ছোটো মেয়ে, সে তখন বাচ্ছা, কর্তাদিদিমার আঙুল টিপে দিতে দিতে কেমন করে মটকে যায়। সে আর সারে না, আঙুলে আঙুলহাড়া হয়ে পেকে ফুলে উঠল। জ্বর হতে লাগল। কর্তাদিদিমা যান-যান

অবস্থা। কর্তাদাদামশায় ছিলেন বাইরে— কর্তাদিদিমা বলতেন, তোরা ভাবিস নে, আমি কর্তার পায়ের ধুলো মাথায় না নিয়ে মরব না, তোরা নিশ্চিন্ত থাক্।

কর্তাদাদামশায় তখন ডালহৌসি পাহাড়ে, খুব সম্ভব রবিকাকাও সে সময়ে ছিলেন তাঁর সঙ্গে। তখনকার দিনে খবরাখবর করতে অনেক সময় লাগত। একদিন তো কর্তাদিদিমার অবস্থা খুবই খারাপ, বাড়ির সবাই ভাবলে আর বুঝি দেখা হল না কর্তাদাদামশায়ের সঙ্গে। অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে, এমন সময়ে কর্তাদাদামশায় এসে উপস্থিত। খবর শুনে সোজা কর্তাদিদিমার ঘরে গিয়ে পাশে দাঁড়ালেন, কর্তাদিদিমা হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। ব্যস, আস্তে আস্তে সব শেষ।

কর্তাদাদামশায় বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাড়ির ছেলেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যা করবার সব করলেন। সেই দেখেছি দানসাগর শ্রাদ্ধ, রুপোর বাসনে বাড়ি ছেয়ে গিয়েছিল। বাড়ির কুলীন জামাইদের কুলীন-বিদেয় করা হয়। ছোটোপিসেমশায় বড়োপিসেমশায় কুলীন ছিলেন, বড়ো বড়ো রুপোর ঘড়া দান পেলেন। কাউকে শাল-দোশালা দেওয়া হল। সে এক বিরাট ব্যাপার।

আর-এক দিদিমা ছিলেন আমাদের, কয়লাহাটার রাজা রমানাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ, নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। রাজা রমানাথ ছিলেন দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভাই। সে দিদিমাও খুব বুড়ি ছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে খুব গল্পগুজব করতুম, তিনিও আমাদের দেখা-দিদিমা, তিনিও যশোরের মেয়ে। আমি যখন বড়ো হয়েছি মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন আমাকে; বলতেন, অবনকে আসতে বোলো, গল্প করা যাবে। সে দিদিমার সঙ্গে আমার খুব জমত। আমি যে স্ত্রী-আচার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম তাতে দরকারি নোটগুলি সব ওই দিদিমার কাছ থেকে পাওয়া। আমার তখন বিয়ে হয়েছে। দিদিমা বউ দেখে খুশি; বলতেন, বেশ, খাসা

বউ হয়েছে, দেখি কী গয়না-টয়না দিয়েছে। ব'লে নেড়ে-চেড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতেন। বলতেন, বেশ দিয়েছে, কিন্তু তোরা আজকাল এই রকম দেখা-গয়না পরিস কেন।

আমি বলতুম, সে আবার কী রকম।

দিদিমা বলতেন, আমাদের কালে এ রকম ছিল না, আমাদের দস্তুর ছিল গয়নার উপরে একটি মসলিনের পটি বাঁধা থাকত।

আমি বলতুম, সে কি গয়না ময়লা হয়ে যাবে বলে।

তিনি বলতেন, না, ঘরে আমরা গয়না এমনিই পরতুম, কিন্তু বাইরে কোথাও যেতে হলেই হাতের চুড়ি-বালা-বাজুর উপরে ভালো করে মসলিনের টুকরো দিয়ে বেঁধে দেওয়াই দস্তুর ছিল তখনকার দিনে। ওই মসলিনের ভিতর দিয়েই গয়নাগুলো একটু একটু ঝক্‌ঝক্‌ করতে থাকত। দেখা-গয়না তো পরে বাঈজী নটীরা, তারা নাচতে নাচতে হাত নেড়েচেড়ে গয়নার ঝকমকানি লোককে দেখায়। খোলা-গয়নার ঝকমকানি দেখানো, ও-সব হচ্ছে ছোটোলোকি ব্যাপার।

খুব পুরোনো মোগল ছবিতে আমারও মনে হয় ও রকম পাতলা রঙিন কাপড় দিয়ে হাতে বাজু বাঁধা দেখেছি। ওই ছিল তখনকার দিনের দস্তুর। এই দেখা-গয়নার গল্প আমি আর কারো কাছে শুনি নি, ওই দিদিমার কাছেই শুনেছি।

তখনকার মেয়েদের সাজসজ্জার আর-একটা গল্প বলি।

ছোটোদাদামশায়ের আর বিয়ে হয় না। কর্তা দ্বারকানাথ ষোলো বছর বয়সে ছোটোদাদামশায়কে বিলেত নিয়ে যান, সেখানেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা হয়। দ্বারকানাথের ছেলে, বড়ো বড়ো সাহেবের বাড়িতে থেকে একেবারে ওইদেশী কায়দাকানুনে দোরস্ত হয়ে উঠলেন। আর, কী সম্মান সেখানে তাঁর। তিনি ফিরে আসছেন দেশে। ছোটোদাদামশায় সাহেব হয়ে ফিরে আসছেন— কী ভাবে জাহাজ থেকে নামেন সাহেবি সুট প'রে, বন্ধুবান্ধব

সবাই গেছেন গঙ্গার ঘাটে তাই দেখতে। তখনকার সাহেবি সাজ জান তো? সে এই রকম ছিল না, সে একটা রাজবেশ— ছবিতে দেখো। জাহাজ তখন লাগত খিদিরপুরের দিকে, সেখান থেকে পানসি করে আসতে হত। সবাই উৎসুক— নগেন্দ্রনাথ কী পোশাকে নামেন। তখনকার দিনের বিলেত-ফেরত সে এক ব্যাপার। জাহাজঘাটায় ভিড় জমে গেছে।

ধুতি পাঞ্জাবি চাদর গায়ে, পায়ে জরির লপেটা, ছোটোদাদা-মশায় জাহাজ থেকে নামলেন। সবাই তো অবাক।

ছোটোদাদামশায় তো এলেন। সবাই বিয়ের জন্য চেষ্টা-চরিত্তির করছেন, উনি আর রাজী হন না কিছুতেই বিয়ে করতে। তখন সবেমাত্র বিলেত থেকে এসেছেন, ওখানকার মোহ কাটে নি। আমাদের দিদিমাকে বলতেন, বউঠান, ওই তো একরত্তি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে তোমরা, আর আমার তাকে পালতে হবে, ও-সব আমার দ্বারা হবে না। সবাই বোঝাতে লাগলেন, তিনি আর ঘাড় পাতেন না। শেষে দিদিমা খুব বোঝাতে লাগলেন; বললেন, ঠাকুরপো, সে আমারই বোন, আমি তার দেখাশোনা সব করব—তোমার কিছুটি ভাবতে হবে না, তুমি শুধু বিয়েটুকু করে ফেলো কোনো রকমে।

অনেক সাধ্যসাধনার পর ছোটোদাদামশায় রাজী হলেন।

ছোটোদিদিমা ত্রিপুরাসুন্দরী এলেন।

ছোট্ট মেয়েটি, আমার দিদিমাই তার সব দেখাশোনা করতেন। বেনে-খোঁপা বেঁধে ভালো শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে দিতেন। বেনে-খোঁপা তিনি চিরকাল বাঁধতেন— আমরাও বড়ো হয়ে তাই দেখেছি, তাঁর মাথায় সেই বেনে-খোঁপা। কোথায় কী বলতে হবে, কী করতে হবে, সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিদিমাই মানুষ করেছেন ছোটো-দিদিমাকে।

তখনকার কালে কর্তাদের কাছে, আজকাল এই তোমাদের

মতো কোমরে কাপড় জড়িয়ে হলুদের দাগ নিয়ে যাবার জো ছিল না। গিন্নিরা ছোটো থেকে বড়ো অবধি পরিপাটিরূপে সাজ ক'রে, আতর মেখে, সিঁদুর-আলতা প'রে, কনেটি সেজে, ফুলের গোড়ে-মালাটি গলায় দিয়ে তবে ঘরে ঢুকতেন।

৫

আজ সকালে মনে পড়ল একটি গল্প— সেই প্রথম স্বদেশী যুগের সময়কার, কী করে আমরা বাংলা ভাষার প্রচলন করলুম।

ভূমিকম্পের বছর সেটা। প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স হবে নাটোরে। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন রিসেপশন কমিটির প্রেসিডেণ্ট। আমরা তাঁকে শুধু 'নাটোর' বলেই সম্ভাষণ করতুম। নাটোর নেমন্তন্ন করলেন আমাদের বাড়ির সবাইকে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে তাঁর ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আমাদের কাউকে ছাড়বেন না— দীপুদা, আমরা বাড়ির অন্য সব ছেলেরা, সবাই তৈরি হলুম, রবিকাকা তো ছিলেনই। আরো অনেক নেতারা, ন্যাশনাল কংগ্রেসের চাঁইরাও গিয়েছিলেন। ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল, ডব্‌লিউ. সি. বোনার্জি, মেজোজ্যাঠামশায়, লালমোহন ঘোষ— প্রকাণ্ড বক্তা তিনি, বড়ো ভালো লোক ছিলেন, আর কী সুন্দর বলতে পারতেন কিন্তু ঝোঁক ওই ইংরেজিতে— সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে, আরো অনেকে ছিলেন— সবার নাম কি মনে আসছে এখন।

তৈরি তো হলুম সবাই যাবার জন্য। ভাবছি যাওয়া-আসা হাঙ্গাম বড়ো। নাটোর বললেন, কিছু ভাবতে হবে না দাদা।

ব্যবস্থা হয়ে গেল, এখান থেকে স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে আমাদের জন্য। রওনা হলুম সবাই মিলে হৈ-হৈ করতে করতে। চোগা-চাপকান পরেই তৈরি হলুম, তখনো বাইরে ধুতি পরে চলাফেরা

অভ্যেস হয় নি। ধুতি-পাঞ্জাবি সঙ্গে নিয়েছি, নাটোরে পৌঁছেই এ-সব খুলে ধুতি পরব।

আমরা যুবকরা ছিলুম একদল, মহাফুর্তিতে ট্রেনে চড়েছি। নাটোরের ব্যবস্থা— রাস্তায় খাওয়াদাওয়ার কী আয়োজন। কিছুটি ভাবতে হচ্ছে না, স্টেশনে স্টেশনে খোঁজখবর নেওয়া, তদারক করা, কিছুই বাদ যাচ্ছে না— মহা আরামে যাচ্ছি। সারাঘাট তো পৌঁছানো গেল। সেখানেও নাটোরের চমৎকার ব্যবস্থা। কিছু ভাববারও নেই, কিছু করবারও নেই, সোজা স্টীমারে উঠে যাওয়া।

সঙ্গের মোটঘাট বিছানা-কম্বল ?

নাটোর বললেন, কিছু ভেবো না। সব ঠিক আছে।

আমি বললুম, আরে, ভাবব না তো কী। ওতে যে ধুতি-পাঞ্জাবি সব-কিছুই আছে।

নাটোর বললেন, আমাদের লোকজন আছে, তারা সব ব্যবস্থা করবে।

দেখি নাটোরের লোকজনেরা বিছানাবাক্স মোটঘাট সব তুলছে, আর আমার কথা শুনে মিটিমিটি হাসছে। যাক, কিছুই যখন করবার নেই, সোজা ঝাড়া হাত-পায় স্টীমারে নির্ভাবনায় উঠে গেলুম। পদ্মা দেখে মহা খুশি আমরা, ফুর্তি আর ধরে না। খাবার সময় হল, ডেকের উপর টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে খাবার জায়গা করা হল। খেতে বসেছি সবাই একটা লম্বা টেবিলে। টেবিলের এক দিকে হোমরাচোমরা চাঁইরা, আর-এক দিকে আমরা ছোকরারা, দীপুদা আমার পাশে। খাওয়া শুরু হল, 'বয়'রা খাবার নিয়ে আগে যাচ্ছে ওই পাশে, চাঁইদের দিকে, ওঁদের দিয়ে তবে তো আমাদের দিকে ঘুরে আসবে। মাঝখানে বসেছিলেন একটি চাঁই; তাঁর কাছে এলেই খাবারের ডিশ প্রায় শেষ হয়ে যায়। কাটলেট এল তো সেই চাঁই ছ-সাতখানা একবারেই তুলে

নিলেন। আমাদের দিকে যখন আসে তখন আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না; কিছু বলতেও পারি নে। পুডিং এল; দীপুদা বললেন, অবন, পুডিং এসেছে, খাওয়া যাবে বেশ করে। দীপুদা ছিলেন খাইয়ে, আমিও ছিলুম খাইয়ে। পুডিং-হাতে বয় টেবিলের এক পাশ থেকে ঘুরে ঘুরে যেই সেই চাঁইয়ের কাছে এসেছে, দেখি তিনি অর্ধেকের বেশি নিজের প্লেটে তুলে নিলেন। ওমা, দীপুদা আর আমি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম। দীপুদা বললেন, হল আমাদের আর পুডিং খাওয়া!

সত্যি বাপু, অমন 'জাইগ্যান্টিক' খাওয়া আমরা কেউ কখনো দেখি নি। ওই রকম খেয়ে খেয়েই শরীরখানা ঠিক রেখেছিলেন ভদ্রলোক। বেশ শরীরটা ছিল তাঁর বলতেই হবে। দীপুদা শেষটায় বয়কে টিপে দিলেন, খাবারটা আগে যেন আমাদের দিকেই আনে। তার পর থেকে দেখতুম, ছুটো করে ডিশে খাবার আসত। একটা বয় ও দিকে খাবার দিতে থাকত আর-একটা এ দিকে। চোখে দেখে না খেতে পাওয়ার জন্য আর আপসোস করতে হয় নি আমাদের।

নাটোরে তো পৌঁছানো গেল। এলাহি ব্যাপার সব। কী সুন্দর সাজিয়েছে বাড়ি, বৈঠকখানা। ঝাড়লণ্ঠন, তাকিয়া, ভালো ভালো দামী ফুলদানি, কার্পেট, সে-সবের তুলনা নেই— যেন ইন্দ্রপুরী। কী আন্তরিক আদরযত্ন, কী সমারোহ, কী তার সব ব্যবস্থা। একেই বলে রাজসমাদর। সব-কিছু তৈরি হাতের কাছে। চাকর-বাকরকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে ঠিক করে রাখা হয়েছিল, না চাইতেই সব জিনিস কাছে এনে দেয়। ধুতি-চাদরও দেখি আমাদের জন্য পাট-করা সব তৈরি, বাক্স আর খুলতেই হল না। তখন বুঝলুম, মোটঘাটের জন্য আমাদের ব্যগ্রতা দেখে ওখানকার লোকগুলি কেন হেসেছিল।

নাটোর বললেন, কোথায় স্নান করবে অবনদা, পুকুরে?

আমি বললুম, না দাদা, সাঁতার-টাতার জানি নে, শেষটায় ডুবে মরব। তার উপর যে ঠাণ্ডা জল, আমি ঘরেই চান করব। চান-টান সেরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেশ ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। আমরা ছোকরার দল, আমাদের তেমন কোনো কাজকর্ম ছিল না। রবিকাকাদের কথা আলাদা। খাওয়া-দাওয়া, ধুমধাম, গল্প-গুজব— রবিকাকা ছিলেন— গানবাজনাও জমত খুব। নাটোরও ছিলেন গানবাজনায় বিশেষ উৎসাহী। তিনিই ছিলেন রিসেপশন কমিটির প্রেসিডেন্ট। কাজেই তিনি সব ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে খবরাখবর করতেন; মজার কিছু ঘটনা থাকলে আমাদের ক্যাম্পে এসে খবরটাও দিয়ে যেতেন। খুব জমেছিল আমাদের। রাজসুখে আছি। ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে, তখনো চোখ খুলি নি, চাকর এসে হাতে গড়গড়ার নল গুঁজে দিলে। কে কখন তামাক খায়, কে দুপুরে এক বোতল সোডা, কে বিকেলে একটু ডাবের জল, সব-কিছু নিখুঁত ভাবে জেনে নিয়েছিল— কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবার জো নেই। খাওয়া-দাওয়ার তো কথাই নেই। ভিতর থেকে রানীমা নিজের হাতে পিঠে-পায়েস করে পাঠাচ্ছেন। তার উপরে নাটোরের ব্যবস্থায় মাছ মাংস ডিম কিছুই বাদ যায় নি, হালুইকর বসে গেছে বাড়িতেই, নানা রকমের মিষ্টি করে দিচ্ছে এবেলা ওবেলা।

আমি ঘুরে ঘুরে নাটোরের গ্রাম দেখতে লাগলুম— কোথায় কী পুরোনো বাড়ি ঘর মন্দির। সঙ্গে সঙ্গে স্কেচ করে যাচ্ছি। অনেক স্কেচ করেছি সেবারে, এখনো সেগুলি আমার কাছে আছে। চাঁইদেরও অনেক স্কেচ করেছি; এখন সেগুলি দেখতে বেশ মজা লাগবে। নাটোরেরও খুব আগ্রহ, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন একেবারে অন্দরমহলে রানী ভবানীর ঘরে। সেখানে বেশ সুন্দর সুন্দর ইঁটের উপর নানা কাজ করা। ওঁর রাজত্বে যেখানে যা দেখবার জিনিস ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। আর আমি স্কেচ

করে নিচ্ছি, নাটোর তো খুব খুশি। প্রায়ই এটা ওটা স্কেচ করে দেবার জন্য ফরমাশও করতে লাগলেন। তা ছাড়া আরো কত রকমের খেয়াল— শুধু আমি নয়, দলের যে যা খেয়াল করছে, নাটোর তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করছেন। ফুর্তির চোটে আমার সব অদ্ভুত খেয়াল মাথায় আসত। একদিন খেতে খেতে বললুম, কী সন্দেশ খাওয়াচ্ছেন নাটোর, টেবিলে আনতে আনতে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। গরম গরম সন্দেশ খাওয়ান দেখি। বেশ গরম গরম চায়ের সঙ্গে গরম গরম সন্দেশ খাওয়া যাবে। শুনে টেবিলসুদ্ধ সবার হো-হো করে হাসি। তক্ষুনি হুকুম হল, খাবার ঘরের দরজার সামনেই হালুইকর বসে গেল। গরম গরম সন্দেশ তৈরি করে দেবে ঠিক খাবার সময়ে।

রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বসল। গোল হয়ে সবাই বসেছি। মেজোজ্যাঠামশায় প্রিসাইড করবেন। ন-পিসেমশাই জানকীনাথ ঘোষাল রিপোর্ট লিখছেন আর কলম ঝাড়ছেন; তাঁর পাশে বসেছিলেন নাটোরের ছোটো তরফের রাজা, মাথায় জরির তাজ, ঢাকাই মসলিনের চাপকান পরে। ন-পিসেমশায় কালি ছিটিয়ে ছিটিয়ে তাঁর সেই সাজ কালো বুটিদার করে দিলেন।

আগে থেকেই ঠিক ছিল, রবিকাকা প্রস্তাব করলেন প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে। আমরা ছোকরারা সবাই রবিকাকার দলে; আমরা বললুম, নিশ্চয়ই, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সে বাংলা ভাষার স্থান হওয়া চাই। রবিকাকাকে বললুম, ছেড়ো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব এজন্য। সেই নিয়ে আমাদের বাধল চাঁইদের সঙ্গে। তাঁরা আর ঘাড় পাতেন না, ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় তেমনি এখানেও হবে সব-কিছু ইংরেজিতে। অনেক তর্কাতর্কির পর দুটো দল হয়ে গেল। একদল বলবে বাংলাতে, একদল বলবে ইংরেজিতে। সবাই মিলে গেলুম প্যাণ্ডেলে।

বসেছি সব, কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হবে। রবিকাকার গান ছিল, গান তো আর ইংরেজিতে হতে পারে না, বাংলা গানই হল। 'সোনার বাংলা' গানটা বোধ হয় সেই সময়ে গাওয়া হয়েছিল— রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।

এখন, প্রেসিডেন্ট উঠেছেন স্পীচ দিতে; ইংরেজিতে যেই-না মুখ খোলা আমরা ছোকরারা যারা ছিলুম বাংলা ভাষার দলে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম— বাংলা, বাংলা। মুখ আর খুলতেই দিই না কাউকে। ইংরেজিতে কথা আরম্ভ করলেই আমরা চেঁচাতে থাকি— বাংলা, বাংলা। মহা মুশকিল, কেউ আর কিছু বলতে পারেন না। তবুও ওই চেঁচামেচির মধ্যেই দু-একজন দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। লালমোহন ঘোষ ছিলেন ঘোরতর ইংরেজিদুরস্ত, তাঁর মতো ইংরেজিতে কেউ বলতে পারত না. তিনি ছিলেন পার্লামেণ্টারি বক্তা— তিনি শেষটায় উঠে বাংলায় করলেন বক্তৃতা। কী সুন্দর তিনি বলেছিলেন। যেমন পারতেন তিনি ইংরেজিতে বলতে তেমনি চমৎকার তিনি বাংলাতেও বক্তৃতা করলেন। আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমাদের তো জয়জয়কার। কন্‌ফারেন্সে বাংলা ভাষা চলিত হল। সেই প্রথম আমরা পাবলিক্‌লি বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।

যাক, আমাদের তো জিত হল; এবারে প্যাণ্ডেলের বাইরে এসে একটু চা খাওয়া যাক। বাড়িতে গিয়েই চা খাবার কথা, তবে ওখানেও চায়ের ব্যবস্থা কিছু ছিল। নাটোর বললেন, কিন্তু গরম গরম সন্দেশ আজ চায়ের সঙ্গে খাবার কথা আছে যে অবনদা। আমি বললুম, সে তো হবেই, এটা হল উপরি-পাওয়া, এখানে একটু চা খেয়ে নিই তো আগে। এখনকার মতো তখন আমাদের খাও খাও বলতে হত না। হাতের কাছে খাবার এলেই তলিয়ে দিতেম।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে এক চুমুক দিয়েছি কি, চার দিক থেকে দুপ্‌দুপ দুপ্‌দুপ শব্দ। ও কী রে বাবা, কামান-টামান কে

ছুঁড়ছে, বোমা নাকি! না বাজি পোড়াচ্ছে কেউ। হাতি খেপল না তো?

ওমা, আবার দুলছে যে দেখি সব— পেয়ালা হাতে যে যার ডাইনে বাঁয়ে দুলছে, প্যাণ্ডেল দুলছে। বহরমপুরের বৈকুণ্ঠবাবু— তিনি ছিলেন খুব গপ্পে', অতি চমৎকার মানুষ— তাড়াতাড়ি তিনি প্যাণ্ডেলের দড়ি দু হাতে দুটো ধরে ফেললেন। দড়ি ধরে তিনিও দুলছেন। কী হল, চার দিকে হরিবোল হরিবোল শব্দ। ভূমিকম্প হচ্ছে। যে যেখানে ছিল ছুটে বাইরে এল, হুলুস্থুলু ব্যাপার— শাঁখ-ঘণ্টা আর হরিবোল হরিবোল ধ্বনিতে একটা কোলাহল বাধল, সেই শুনে বুক দমে গেল। কাঁপুনি আর থামে না, থেকে থেকে কাঁপছেই কেবল।

কিছুক্ষণ কাটল এমনি। এবারে সব বাড়ি যেতে হবে। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ একটা চওড়া ফাটল। এই বারান্দাটার মতো চওড়া যেন একটা খাল চলে গেছে। অনেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হলেন, আমি আর লাফিয়ে যেতে সাহস পাই নে। ফাটলের ভিতর থেকে তখনো গরম ধোঁয়া উঠছে। ভয় হয় যদি পড়ে যাই কোথায় যে গিয়ে ঠেকব কে জানে। সবাই মিলে ধরাধরি করে কোনো রকমে তো ও পারে টেনে তুললে আমাকে। এগোচ্ছি আস্তে আস্তে। আশু চৌধুরী ছিলেন আমাদের দলেরই লোক, বড়ো নার্ভাস, তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাত-পা নেড়ে বললেন, ওদিকে যাচ্ছ কোথায়। টেরিবল্ বিজ্‌নেস্, একেবারে দ' পড়েছে সামনে।

আমি বললুম, দ' কী।

তিনি বললেন, আমি দেখে এলুম নদী উপছে এগিয়ে আসছে।

আমি বললুম, দূর হোকগে ছাই! ভাবলুম কাজ নেই বাড়ি গিয়ে, চলো সব রেল-লাইনের দিকে, উঁচু আছে, ডুববে না জলে।

চলতে চলতে এই-সব বলাবলি করছি, এমন সময় লোকজন এসে খবর দিলে, চলুন রাজবাড়ির দিকে, ভয় নেই কিছু।

রাস্তায় আসতে আসতে দেখি কত বাড়িঘর ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে। পুকুরপাড়ে বড়ো সুন্দর পুরোনো একটি মন্দির ছিল, কী সুন্দর কারুকাজ-করা। নাটোরের বড়ো শখ ছিল সেই মন্দিরটির একটি স্কেচ করে দিই; বলেছিলেন, অবনদা, এটা তোমাকে করে দিতেই হবে। আমি বলেছিলুম, নিশ্চয়ই, আজ বিকেলেই এই মন্দিরটির একটি স্কেচ করব। পথে দেখি সেই মন্দিরটির কেবল চুড়োটুকু ঠিক আছে, আর বাদবাকি সব গুঁড়িয়ে গেছে। মন্দিরটির উপরে চুড়োটুকু ডাঁটভাঙা কারুকার্য-করা রাজছত্রের মতো পড়ে আছে। নাটোরের বৈঠকখানা ভেঙে একেবারে তচ্‌নচ্‌। আহা, এমন সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন তিনি। ঝাড়লণ্ঠন ফুলদানি সব গুঁড়ো গুঁড়ো ঘরময় ছড়াছড়ি। রাজবাড়ির ভিতরে খবর গেছে আমরা সব প্যাণ্ডেল চাপা পড়েছি, রানীমা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন। তাঁকে অনেক বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করা হয় যে আমরা কেউ চাপা পড়ি নি, সবাই সশরীরে বেঁচে আছি।

কোথায় গেল গরম গরম সন্দেশ খাওয়া। সেই রাত্রে বাঈজীর নাচ হবার কথা ছিল। নাটোর বলেছিলেন এখানে নাচ দেখে যেতে হবে— সব জোগাড়যন্তোর করা হয়েছিল। চুলোয় যাকগে নাচ, বৈঠকখানা তো ভেঙে চুরমার।

চার দিকে যেন একটা প্রলয়কাণ্ড হয়ে গেছে। সব উৎসাহ আমাদের কোথায় চলে গেল। কলকাতায় মা আর সবাই আমাদের জন্য ভেবে অস্থির, আমরাও করি তাঁদের জন্য ভাবনা। অথচ চলে আসবার উপায় নেই; রেললাইন ভেঙে গেছে, নদীর উপরের ব্রিজ ঝুর্‌ঝুরে অবস্থায়, টেলিগ্রাফের লাইন নষ্ট। তবু কী ভাগ্যিস আমাদের একটি তার কী করে মার কাছে এসে পৌঁচেছিল, ‘আমরা সব ভালো’। আমরাও তাঁদের একটিমাত্র তার পেলুম

যে তাঁরাও সবাই ভালো আছেন। আর-কারো কোনো খবরা-খবর করবার বা নেবার উপায় নেই। কী করি, চলে আসবার যখন উপায় নেই থাকতেই হচ্ছে ওখানে। নাটোরকে বললুম, কিন্তু তোমার বৈঠকখানা-ঘরে আর ঢুকছি না। রবিকাকারও দেখি তাই মত, পাকা ছাদের নীচে ঘুমোবার পক্ষপাতী নন। তখনো পাঁচ মিনিট বাদে বাদে সব কেঁপে উঠছে। কখন বাড়িঘর ভেঙে পড়ে ঘাড়ে, মরি আর কি চাপা পড়ে! বললুম, অন্য কোথাও বাইরে জায়গা করো।

নাটোরের একটা কাছারি বাংলো ছিল একটু দূরে, বেশ বড়োই। ভিতরে ঢুকে আগে দেখলুম ছাদটা কিসের— দেখি, না, ভয়ের কিছু নেই, ছাদটি খড়ের, নীচে ক্যান্‌ভাসের চাঁদোয়া দেওয়া। ভাবলুম যদি চাপা পড়ি, না-হয় ক্যান্‌ভাস ছিঁড়েফুঁড়ে বের হতে পারব কোনোরকমে। ঠিক হল সেখানেই থাকব, ব্যবস্থাও হয়ে গেল। খাবার জায়গা হল গাড়িবারান্দার নীচে। তেমন কিছু হয় তো চট্ করে বাগানে বেরিয়ে পড়া যাবে সহজেই।

মেজোজ্যাঠামশায় অদ্ভুত লোক। তিনি কিছুতেই মানলেন না; তিনি বললেন, আমি ওই আমার ঘরেতেই থাকব, আমি কোথাও যাব না। নাটোর পড়লেন মহা বিপদে। এখন কিছু একটা ঘটে গেলে উপায় কী। মেজোজ্যাঠামশায় কিছুতেই কিছু শুনলেন না; শেষে কী করা যায়, নাটোর হুকুম দিলেন ছ-সাতজন লোক দিনরাত ওঁর ঘরের সামনে পাহারা দেবে। তেমন তেমন দেখলে যেমন করে হোক মেজোজ্যাঠামশায়কে পাঁজাকোলা করে বাইরে আনবে। নয় তো তাদের আর ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

চলতে লাগল সেই দিনটা এমনি করেই। এখন, মুশকিল হচ্ছে চানের ঘর নিয়ে। চানের ঘরে ঢুকে লোকে চান করছে এমন সময়ে হয়তো আবার কাঁপুনি শুরু হল; তাড়াতাড়ি গামছা

পরে যে যে-অবস্থায় আছে বেরিয়ে আসেন। এ এক বিভ্রাট। চানের ঘরে কেউ আর ঢুকতে পারেন না।

দীপুদার একদিন কী হয়েছিল শোনো। কাঁপুনি শুরু হয়েছে, তিনি ছিলেন একতলার ঘরে, জানলা দিয়ে বাইরে এক লাফে বেরিয়ে এলেন। ওই তো মোটা শরীর, নীচে ছিল কতকগুলি সোডার বোতল, পড়লেন তারই উপরে। ভাগ্যিস সেগুলি খালি ছিল নয়তো ফেটেফুটে কী একটা ব্যাপার হত সেদিন।

এমনিতরো এক-একটা কাণ্ড হতে লাগল।

ভূমিকম্পের পরদিন আমরা কয়েকজন মিলে এক জায়গায় বসে গল্প করছি, এমন সময়ে আমাদেরই বয়সী একজন ভলেন্টিয়ার দেখি চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে, ও মশাই, দেখুনসে। ও মশাই, দেখুনসে।

কী ব্যাপার।

বিলেত-ফেরত সাহেব চাঁইরা গামছা পরে পুকুরে নেবেছেন। ভূমিকম্পের ভয়ে কেউ আর চানের ঘরে ঢুকে আরাম করে চান করতে ভরসা পান না, কখন হঠাৎ আবার কাঁপুনি শুরু হবে। কয়েকজন দৌড়ে দেখতে গেল, আমরা আর গেলুম না। একটা হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। সাহেবি সাজ ঘুচল চাঁইদের এখানে এসে। আমাদের ভারি মজা লাগল।

পরদিন খবর পাওয়া গেল, একখানি টেস্ট ট্রেন যাবে কাল। তাতে 'রিস্ক্‌' আছে। ট্রেন নদীর এ পারে আসবে না, নদী পেরিয়ে ও পারে ট্রেন ধরতে হবে। আমরা সবাই যাবার জন্য ব্যস্ত ছিলুম। রবিকাকাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, বাড়ির জন্য ওরকম ভাবতে তাঁকে কখনো দেখি নি— মুখে কিছু বলতেন না অবশ্য, তবে খবর পাওয়া গিয়েছিল কলকাতায় বাড়ি দু-এক জায়গায় ধসে গেছে, তাই সবার জন্যে ভাবনায় ছিলেন খুব। আমরাও ভাবছিলুম, তবে জানি মা আছেন বাড়িতে, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই। অন্যরাও যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

ঘোড়ার গাড়ি একখানি পাওয়া গেল, ঠিকেগাড়ি। তাতে করেই আসতে হবে আমাদের নদীর ব্রিজের কাছ পর্যন্ত। আমরা কয়জন এক গাড়িতে ঠেসাঠেসি করে; দীপুদা উঠে বসলেন ভিতরে, ব্যাপার দেখে আমি একেবারে কোচ-বক্সে চড়ে বসলুম। যাক, সকলে তো নদীতে এসে পৌঁছলুম। এখন নদী পার হতে হবে। দু রকমে নদী পার হওয়া যায়। এক হচ্ছে রেলওয়ে ব্রিজের উপর দিয়ে; আর হচ্ছে নদীতে জল বেশি ছিল না, হেঁটেই এ পারে চলে আসা। ব্রিজটা ভূমিকম্পে একেবারে ভেঙে পড়ে যায় নি অবশ্য; কিন্তু জায়গায় জায়গায় একেবারে ঝুর্‌ঝুরে হয়ে গেছে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যাবার ভরসা হয় না। আমরা ঠিক করলুম হেঁটেই নদী পার হব। রবিকাকারও তাই ইচ্ছে। চাঁইরা ঘাড় বেঁকিয়ে রইলেন— তাঁরা ওই ব্রিজের উপর দিয়েই আসবেন। আমরা তো জুতো খুলে বগলদাবা করে, পাজামা হাঁটু অবধি টেনে তুলে, ছপ্‌ছপ্‌ করে নদী পেরিয়ে ও পারে উঠে গেলুম। ও পারে গিয়ে দেখি চাঁইরা তখন দু-এক পা করে এগোচ্ছেন ব্রিজের উপর দিয়ে। রেলগাড়ি যায় যে ব্রিজের উপর দিয়ে তা দেখেছ তো? একখানা করে কাঠ আর মাঝখানে খানিকটা করে ফাঁক। ঝর্‌ঝরে ব্রিজ, তার পরে ওই রকম থেকে থেকে ফাঁক— পা কোথায় ফেলতে কোথায় পড়বে। চাঁইরা তো দু-পা এগিয়েই পিছোতে শুরু করলেন। ব্রিজের যা অবস্থা আর এগোতে সাহস হল না তাঁদের। যেই-না চাঁইরা পিছন ফিরলেন, আমাদের এ পারে রব উঠল— ঘুরেছে, ঘুরেছে। আরে কী ঘুরেছে, কে ঘুরেছে। সবাই ফিসফাস করছি— চাঁইরা ঘুরেছে, ঘুরেছে, ঘুরেছে। মহাফুর্তি আমাদের। তার পর আর কী, দেখি আস্তে আস্তে তারা নদীর দিকে নেমে আসছেন। সাহেবি সাজ তো আগেই ঘুচেছিল, এবার সাহেবিয়ানা ঘুচল। জুতোমোজা খুলে প্যান্টুলুন টেনে তুলতে তুলতে চাঁইরা নদী পার হলেন।

আমরা ঠিক করলুম ট্রেনের প্রথম কামরাটা নিতে হবে আমাদের দখলে। রবিকাকাকে নিয়ে আমরা আগে আগে এগিয়ে চললুম। প্রথম কামরায় আমরা বন্ধুবান্ধবরা মিলে যে যার বিছানা পেতে জায়গা জুড়ে নিলুম। দীপুদা দু বেঞ্চের মাঝখানে নীচে বিছানা করে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। রবিকাকাও বেঞ্চের এক পাশে বসে কাউকে ওঠানামা করতে দিচ্ছেন না পাছে জায়গা বেদখল হয়ে যায়। বৈকুণ্ঠবাবু ছিলেন খুব গল্পে' মানুষ তা আগেই বলেছি, তাঁকে নিলুম ডেকে আমাদের কামরায়— বেশ গল্প শুনতে শুনতে যাওয়া যাবে। চাঁইদের জব্দ করে আমরা তো খুব খুশি। রবিকাকাও যে মনে মনে ওঁদের উপর চটেছিলেন মুখে কিছু না বললেও টের পেলুম তা। একজন পাড়াগেঁয়ে সাহেব, রবিকাকার বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি, খুব চালের মাথায় ঘোরাঘুরি করছেন আর মুখ বেঁকিয়ে বাঁকা ইংরেজিতে খোঁজ নিচ্ছিলেন আমাদের কামরায় জায়গা আছে কি না। রবিকাকা যেন চিনতে পারেন নি এমনি ভাব করে চুপ করে বসে রইলেন। দীপুদা শুয়ে ছিলেন— পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে দেখে নিলেন কে কথা কইছে। দেখেই তিনি বলে উঠলেন, আরে, তুই কোত্থেকে। অমুক জায়গার অমুক না তুই।

আর যায় কোথায়— কোথায় গেল তাঁর চাল, কোথায় গেল তাঁর সাহেবিয়ানা, ধরা পড়ে যেন চুপসে এতটুকু হয়ে গেলেন।

তখন রবিকাকাও বললেন, ও তুমি অমুক, আমি চিনতেই পারি নি তোমাকে।

বেচারি পাড়াগেঁয়ে সাহেবটি কাঁচুমাচু হয়ে যায় আর কি।

ট্রেন ছাড়ল, গল্পগুজবে মশগুল হয়ে মহা আনন্দে সবাই বাড়ি ফিরে এলুম। এইভাবে আমাদের বাংলা ভাষার বিজয়যাত্রা আমরা শেষ করলুম।

৬

এইবারে হিন্দুমেলার গল্প বলি শোনো। একটা ন্যাশনাল স্পিরিট কী করে তখন জেগেছিল জানি নে, কিন্তু চার দিকেই ন্যাশনাল ভাবের ঢেউ উঠেছিল। এটা হচ্ছে আমার জ্যাঠামশায়দের আমলের, বাবামশায় তখন ছোটো। নবগোপাল মিত্তির আসতেন, সবাই বলতেন ন্যাশনাল নবগোপাল, তিনিই সর্বপ্রথম ন্যাশনাল কথাটার প্রচলন করেন। তিনিই চাঁদা তুলে 'হিন্দুমেলা' শুরু করেন। তখনো ন্যাশনাল কথাটার চল হয় নি। হিন্দুমেলা হবে, মেজোজ্যাঠামশায় গান তৈরি করলেন—

মিলে সবে ভারতসন্তান
একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।

এই হল তখনকার জাতীয় সংগীত। আর-একটা গান গাওয়া হত সে গানটি তৈরি করেছিলেন বড়োজ্যাঠামশায়—

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত, তোমারি—
রাত্রিদিবা ঝরে লোচনবারি।

এই গানটি বোধ হয় রবিকাকাই গেয়েছিলেন হিন্দুমেলাতে। এই হল আমাদের আমলের সকাল হবার পূর্বেকার সুর; যেন সূর্যোদয় হবার আগে ভোরের পাখি ডেকে উঠল। আমরাও ছেলেবেলায় এই-সব গান খুব গাইতুম।

বড়োজ্যাঠামশায়ের তখনকার দিনের লেখা চিঠিতে দেখেছি, এই নবগোপাল মিত্তিরের কথা। তিনিই উদ্যোগ করে হিন্দুমেলা করেন। গুপ্তবৃন্দাবনের বাগানে হিন্দুমেলা হত। নামটা অদ্ভুত, শুনে খোঁজ করে জানলুম, বাগানটার নামে একটা মজার গল্প চলিত আছে।

পূর্বকালে পাথুরেঘাটার ঠাকুর-বংশেরই একজন কেউ ছিলেন

বাগানের মালিক। প্রায় শতাধিক বছর আগেকার কথা। মা তাঁর বুড়ি হয়ে গেছেন, বুড়ি মার শখ হল, একদিন ছেলেকে বললেন, বাবা, বৃন্দাবন দেখব। আমাকে বৃন্দাবন দেখালি নে!

ছেলে পড়লেন মহা ফাঁপরে— এই বুড়ি মা, বৃন্দাবনে যাওয়া তো কম কথা নয়, যেতে যেতে পথেই তো কেষ্ট পাবেন। তখনকার দিনে লোকে উইল করে বৃন্দাবনে যেত। আর যাওয়া আসা, ও কি কম সময় আর হাঙ্গামার কথা, যেতে আসতে দু-তিন মাসের ধাক্কা। তা, ছেলে আর কী করেন, মার শখ হয়েছে বৃন্দাবন দেখবার; বললেন, আচ্ছা মা, হবে। বৃন্দাবন তুমি দেখবে।

ছেলে করলেন কী এখন, লোকজন পাঠিয়ে পাণ্ডা পুরুত আনিয়ে সেই বাগানটিকে বৃন্দাবন সাজালেন। এক-একটা পুকুরকে এক-একটা কুণ্ড বানালেন, কোনোটা রাধাকুণ্ড, কোনোটা শ্যামকুণ্ড, কদমগাছের নীচে বেদী বাঁধলেন। পাণ্ডা বোষ্টম বোষ্টমী দ্বারপাল, মায় শুকশারী, নানা রকম হরবোলা পাখি সব ছাড়া গাছে গাছে, ও দিকে আড়াল থেকে বহুরূপী নানা পাখির ডাক ডাকছে, সব যেখানে যা দরকার। যেন একটা স্টেজ সাজানো হল তেমনি করে সব সাজিয়ে, বৃন্দাবন বানিয়ে, মাকে তো নিয়ে এলেন সেখানে পাল্কি বেহারা দিয়ে।

বুড়ি মা তো খুব খুশি বৃন্দাবন দেখে। সব কুণ্ডে স্নান করলেন, কদমগাছ দেখিয়ে ছেলে মাকে বললেন, এই সেই কেলিকদম্ব যে-গাছের নীচে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন। এই গিরিগোবর্ধন। এই কেশীঘাট। রাখাল-বালক সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, তাদের দেখিয়ে বললেন, ওই সব রাখাল-বালক গোরু চরাচ্ছে। এটা ওই, ওটা ওই। বোষ্টম-বোষ্টমীদের গান, ঠাকুরদেবতার মূর্তি, এ-সব দেখে বুড়ির তো আনন্দ আর ধরে না। টাকাকড়ি দিয়ে জায়গায় জায়গায় পেন্নাম করছেন, ওঁদেরই লোকজন সব সেজেগুজে বসে ছিল, তাদেরই লাভ।

বৃন্দাবন দেখা হল, যাবার সময় হল। বুড়ি বললেন, আচ্ছা বাবা, শুনেছি বৃন্দাবন এক মাস যেতে লাগে, এক মাস আসতে লাগে, তবে আমাকে তোমরা এত তাড়াতাড়ি কী করে নিয়ে এলে।

ছেলে বললেন, ও-সব ব্যবস্থা করা ছিল মা, সব ব্যবস্থা করা ছিল। পঁচিশ-পঁচিশটে বেয়ারা লাগিয়ে দিলুম পাল্কিতে, হু-হু করে নিয়ে এল তোমাকে! এ কী আর যে-সে লোকের আসা!

বুড়ি বললেন, তা বাবা, বেশ। তবে বৃন্দাবনে তো শুনেছি এ-রকম বাড়ি ঝাড়লণ্ঠন নেই। এ-বাড়ি তো আমাদের বাড়ির মতো।

ছেলে বললেন, এ হচ্ছে মা, গুপ্তবৃন্দাবন। সে ছিল পুরোনো কালের কথা, সে বৃন্দাবন কী আর এখন আছে, সে লুকিয়েছে।

বুড়ি তো খুশিতে ফেটে পড়েন, ছেলেকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ি ফিরে এসে কেষ্ট পেলেন। সেই থেকে সেই বাগানের নামকরণ হল গুপ্তবৃন্দাবন।

সেই গুপ্তবৃন্দাবনে হিন্দুমেলা, আমরা তখন খুব ছোটো। ফি বছরে বসন্তকালে মেলা হয়। যাবতীয় দেশী জিনিস তাতে থাকত। শেষ যেবার আমরা দেখতে গিয়েছিলুম এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে— বাগানময় মাটির মূর্তি সাজিয়ে রাখত; এক-একটি ছোট্ট চাঁদোয়া টাঙিয়ে বড়ো বড়ো মাটির পুতুল তৈরি করে কোনোটাতে দশরথের মৃত্যু, কৌশল্যা বসে কাঁদছেন, এই-রকম পৌরাণিক নানা গল্প মাটির পুতুল দিয়ে গড়ে বাগানময় সাজানো হত। কী সুন্দর তাদের সাজাত, মনে হত যেন জীবন্ত। পুকুরেও নানা রকম ব্যাপার। কোনো পুকুরে শ্রীমন্ত সওদাগরের নৌকো, সওদাগর চলেছেন বাণিজ্যে ময়ূরপঙ্খি নৌকো করে, মাঝিমাল্লা নিয়ে। নৌকোটা আবার চলতও মাঝে মাঝে। কোনো পুকুরে কালীয়-দমন। একটা পুকুরে ছিল— সে যে কী করে সম্ভব হল ভেবেও পাই নে —জল থেকে কমলে কামিনী উঠছে, একটা হাতি গিলছে আর ওগরাচ্ছে। সে ভারি মজার ব্যাপার। পুতুল-হাতির ওই ওঠানামা

দেখে সকলে অবাক। তা ছাড়া কুস্তি হত, রায়বেঁশে নাচ হত, বাঁশবাজি খেলা, আরো কত কী। তাদের আবার প্রাইজ দেওয়া হত।

এই তো গেল বাইরের ব্যাপার। ঘরের ভিতরেও নানা দেশের নানা জিনিসের এক্‌জিবিশন— ছবি, খেলনা, শোলার কাজ, শাড়ি, গয়না। মোট কথা, দেশের যা-কিছু জিনিস সবই সেখানে দেখানো হত। সন্ধেবেলা নানা রকম বৈঠক বসত— কথকতা নাচগান আমোদ-আহ্লাদ সবই চলত। রামলাল চাকর আমাদের ঘরে ঘরে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াত। একটা দিল্লির মিনিয়েচার ছিল গোল কাঁচের মধ্যে, এত লোভ হয়েছিল আমার সেটার জন্য। বেশি দাম বলে কেউ দিলে না কিনে, ছু-চারটা খেলনা দিয়েই ভুলিয়ে দিলে। কিন্তু আমি কি আর ভুলি। কী সুন্দর ছিল জিনিসটি, এখনো আমার মনে পড়ে।

আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি বারান্দা থেকে গাছের সঙ্গে একটা মোটা দড়ি বাঁধা হয়েছে। বল্‌ডুইন সাহেব, আমরা বলতুম ব্লণ্ডিন সাহেব, দড়ার উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে গেলেন; একটা চাকার মতো কী যেন তাও পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে গড়িয়ে নিলেন। চার দিকে বাহবা রব।

বাঁশবাজির বেদেনী ছিল কয়েকজন মেলাতে; তারা বললে, ও আর কী বাহাত্নরি। খাঁজকাটা জুতো পরে দড়ার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া তো সহজ। আমরা খালি পায়ে হাঁটতে পারি। এই বলে বেদেনীরা কয়েকজন পায়ের নীচে গোরুর শিঙ বেঁধে সেই দড়ার উপর দিয়ে হেঁটে নেচে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিলে। কোথায় গেল তার কাছে ব্লণ্ডিন সাহেবের রোপ-ওয়াকিং।

এই-সব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছি, এমন সময় চারি দিকে মার-মার মার-মার হৈ-হৈ পালা-পালা রব। যে যেদিকে পারছে কেউ পাঁচিল টপকে কেউ রেলিং বেয়ে ফটকের নীচে গলিয়ে

ছুটছে, পালাচ্ছে। আমরা ছেলেমানুষ, কিছু বুঝি না কী ব্যাপার, হকচকিয়ে গেলুম। রামলাল আমাদের হাত ধরে টানতে টানতে দৌড়ে ফটকের কাছে নিয়ে গেল। ফটক বন্ধ, লোহার গরাদ দেওয়া, খোলা শক্ত। তখনো চার দিকে হুড়োহুড়ি ব্যাপার চলছে। সঙ্গে ছিলেন কেদার মজুমদার— ছোটোদিদিমার ভাই, আমরা বলতুম কেদারদা— আর ফটকের ওপারে ছিলেন শ্যামবাবু, জ্যোতিকাকামশায়ের শ্বশুর। অসম্ভব শক্তি ছিল তাঁদের গায়ে। কেদারদা দু-হাতে আমাদের ধরে এক এক ঝটকায় একেবারে ফটক টপকে ও ধারে শ্যামবাবুর কাছে জিম্মে করে দিচ্ছেন।

স্বর্ণবাঈ ছিল সেকালের প্রসিদ্ধ বাঈজী, তারই জন্য কী একটা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়।

সেই আমাদের হিন্দুমেলাতে শেষ যাওয়া। তার পরও কিছু-কাল অবধি হিন্দুমেলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের আর যেতে দেওয়া হয় নি। হিন্দুমেলা, সে প্রকাণ্ড ব্যাপার তখনকার দিনে। তার অনেক পরে হিন্দুমেলারই আভাস দিয়ে মোহন-মেলা, কংগ্রেস-মেলা, এ মেলা সে মেলা হয়, কিন্তু অতবড়ো নয়। হিন্দুমেলার উদ্দেশ্যই ছিল ভারতপ্রীতি ও আজকাল তোমাদের যে কথা হয়েছে কৃষ্টি— সেই কৃষ্টির উপর তার প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু বাঙালির যা বরাবর হয়, শেষটায় মারামারি করে কৃষ্টি কেষ্ট পায়, হিন্দুমেলারও তাই হল।

নবযুগের গোড়াপত্তন করলেন নবগোপাল মিত্তির। চার দিকে ভারত, ভারত— 'ভারতী' কাগজ বের হল। বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। ভারতীয় ভাবের উৎপত্তি হল ওই তখন থেকেই, তখন থেকেই সবাই ভারত নিয়ে ভাবতে শিখলে।

তার পর অনেক কাল পরে, বাবামশায় তখন মারা গেছেন, নবগোপাল মিত্তিরের বৃদ্ধ অবস্থা, তখনো তাঁর শখ একটা-কিছু ন্যাশনাল করতে হবে। আমরা তখন বেশ বড়ো হয়েছি, একদিন

নবগোপাল মিত্তির এসে উপস্থিত ; বললেন, একটা কাণ্ড করেছি, দেশী সার্কাস পার্টি খুলেছি। ও ব্যাটারাই সার্কাস দেখাতে পারে, আর আমরা পারি নে, তোমাদের যেতে হবে।

আমি বললুম, সে কী কথা, দেশী সার্কাস পার্টি! মেম যে ঘোড়ার পিঠে নাচে, সে কোথায় পাবেন আপনি ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সব যোগাড়-যন্তোর করেছি, শিখিয়েছি, তৈরি করেছি কেমন সব দেখবে'খন।

গেলুম আমরা নবগোপাল মিত্তিরের দেশী সার্কাস পার্টিতে। না গিয়ে পারি ? একটা গলিজ জায়গা ; গিয়ে দেখি ছোট্ট একখানা তাঁবু ফেলেছে, কয়েকখানা ভাঙা বেঞ্চি ভিতরে, আমরা ও আরো কয়েকজন জানাশোনা ভদ্রলোক বসেছি। সার্কাস শুরু হল। টুকিটাকি দুটো-একটা খেলার পর শেষ হবে ঘোড়ার খেলা দেখিয়ে। দেশী মেয়ে ঘোড়ার খেলা দেখাবে। দেখি কোত্থেকে একটা ঘোড়া হাড়গোড়-বের-করা ধরে আনা হয়েছে, মেয়েও একটি জোগাড় হয়েছে, সেই মেয়েকে সার্কাসের মেমদের মতো টাইট পরিয়ে সাজানো হয়েছে। দেশী মেয়ে ঘোড়ায় চেপে তো খানিক দৌড়ঝাঁপ করে খেলা শেষ করলে। এই হল দেশী সার্কাস।

নবগোপাল মিত্তির ওই পর্যন্ত করলেন, দেশী সার্কাস খুলে দেশী মেয়েকে দিয়ে ঘোড়ার খেলা দেখালেন। কোথায় হিন্দুমেলা আর কোথায় দেশী সার্কাস। সারা জীবন এই দেশী দেশী করেই গেলেন, নিজের যা-কিছু টাকাকড়ি সব ওইতেই খুইয়ে শেষে ভিক্ষেশিক্ষে করে সার্কাস দেখিয়ে গেলেন।

সেই স্রোত চলল। তার অনেক দিন পরে এলেন রামবাবু। তাঁরও নবগোপাল মিত্তিরের মতোই ন্যাশনাল ধাত ছিল। তিনি এসে বললেন, বেলুনে উড়ব, ওরাই কেবল পারে আর আমরা পারব না ?

তার আগেই স্পেন্সার সাহেব, মস্ত বেলুনবাজ, বেলুন দেখিয়ে নাম করে গেছেন।

গোপাল মুখুজ্জের হলেতে থান থান তসর গরদ কেটে বেলুন তৈরি হল, একদিন তিনি উড়লেনও সেই বাঁধা বেলুনে; তার আবার পাল্টা জবাব দিলে সাহেবরা খোলা বেলুনে উড়ে। রামবাবুর রোখ চেপে গেল; তিনি বললেন, আমিও উড়ব খোলা বেলুনে, প্যারাস্যুট দিয়ে নামব।

আবার সেই গোপাল মুখুজ্জের হলেই প্যারাস্যুট বেলুন তৈরি হল। গোপাল মুখুজ্জের অনেক টাকা খরচ হয়েছিল এই-সব করতে। নারকেলডাঙার যেখানে গ্যাস তৈরি হয় সেখান থেকে বেলুন ছাড়া হবে, আমরা অনেকেই সেখানে জড়ো হয়েছি। প্রথম বাঙালি বেলুনে উড়ে প্যারাস্যুট দিয়ে নামবে, আমাদের মহা উৎসাহ। সব ঠিকঠাক, বেলুন তো উড়ল, তখনো বাঁধা আছে দড়ির সঙ্গে, কথা ছিল রামবাবু রুমাল নাড়লে দড়ি কেটে দেওয়া হবে। খানিকটা উঠে রামবাবু রুমাল নাড়লেন, অমনি খটাস করে দড়ি কেটে দেওয়া হল। বেলুন উপরে উঠছে তো উঠছেই। দেখতে দেখতে বেলুন একেবারে বুঁদ হয়ে গেল। আমরা তো সব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ভাবছি এখনো রামবাবু লাফিয়ে পড়ছেন না কেন। লাখো সাহেবও ছিলেন সেই ভিড়ে— মস্ত সায়েন্টিস্ট— তিনি বললেন আর নামতে পারবেন না রামবাবু, একেবারে কোল্ড ওয়েভের মধ্যে চলে গেছেন, সেখান থেকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব নয়।

আমাদের তো সবার মুখ চুন। গোপাল মুখুজ্জের টাকা গেল, বেলুন গেল, আবার রামবাবুও গেলেন দেখছি।

দূরবীন লাগিয়ে দেখছি; দেখতে দেখতে এক সময়ে দেখলুম, রামবাবু যেন লাফিয়ে পড়লেন বেলুন থেকে। বেলুন তো আরো উপরে উঠে গেল, আর রামবাবু লাফিয়ে পড়ে পাক খেতে লাগলেন

কেবলই, প্যারাস্থট আর খোলে না। আমরা ভাবছি গেল রে, সব গেল এইবার। শূন্যে পাক খাওয়া মানে বুঝতেই পারো, এক-একবারে পঞ্চাশ-ষাট হাত নেমে আসছেন। এই-রকম দু-তিনবার পাক খাবার পর প্যারাস্থট খুলল। আমরা সব আনন্দে হাততালি দিয়ে রুমাল উড়িয়ে টুপি উড়িয়ে দু-হাত তুলে নাচছি— জয় রামবাবুকী জয়, জয় রামবাবুকী জয়! সে যা শোভা আমাদের তখন, যদি দেখতে হেসে বাঁচতে না। দুপুর রোদ্দুরে দু-হাত তুলে সবার নৃত্য। রবিকাকা ছিলেন না সেখানে, তিনি বোধ হয় সে সময়ে অন্য কোথাও ছিলেন। যাক, আস্তে আস্তে প্যারাস্থট তো নামল। আমরা দৌড়ে গিয়ে রামবাবুকে ধরে নামিয়ে হাওয়া করে শরবত-টরবত খাইয়ে সুস্থির করি। পরে জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা, বেলুন থেকে লাফিয়ে পড়তে এত দেরি করলেন কেন, বুঝতে পারেন নি বুঝি?

তিনি বললেন, আরে না না, ও-সব না। বুঝতে ঠিকই পেরেছিলুম, কিন্তু যত বারই লাফিয়ে পড়বার জন্য দড়ি ধরতে যাই মনের ভিতর কেমন যেন করে ওঠে, হাত সরিয়ে নিই। তার পরে যখন দেখলুম বেলুন উঠতে উঠতে এত উপরে উঠে গেছে যে আর কিছুই প্রায় দেখা যায় না তখন সাহসে ভর করে 'জয় মা' বলে লাফিয়ে পড়লুম।

যাক, দেশী লোকের খোলা বেলুনে ওড়াও হল, প্যারাস্থট দিয়ে নামাও হল।

এবারে রামবাবু বললেন, বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। নবগোপালবাবু যা পারেন নি সেইটে তিনি করলেন। রামবাবু বললেন, ও-সব নয়, আমি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে লড়াই করব।

কোথেকে একটা কেঁদো বাঘ জোগাড় করে একদিন খেলা দেখালেন পাথুরেঘাটার রাজবাড়িতে। রামবাবু বললেন, সাহেব

বেটারা আর কী খেলা দেখায় বাঘের, দু পাশে দুটো বন্দুক নিয়ে লোহার খাঁচার ভিতরে। আমি দেখাব খেলা খোলা উঠানে।

ছোটো একটা খাঁচায় বাঘটাকে আনা হল। রামবাবু বাঘের খেলা দেখালেন; ঘুষোঘাষা চড়চাপড় মেরে কেমন করে বেশ বাগে আনলেন বাঘটাকে। খেলা দেখিয়ে আবার খাঁচায় পুরে দিলেন।

অসীম সাহসী ছিলেন তিনি। ওই বাঘের খেলাই তাঁর শেষ কীর্তি। কিছুদিন বাদে শুনি তিনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন হিমালয়ে। এখনো নাকি তিনি জীবিত আছেন, চন্দ্রস্বামী না কী নাম নিয়ে হিমালয় পাহাড়ে তপস্যা করছেন।

৭

এখন থিয়েটারের গোড়াপত্তন কী করে হল শোনো। দ্বারকানাথ ঠাকুরের থিয়েটার ছিল চৌরঙ্গীতে, এখন যেখানে মিসেস-মঙ্কের গ্রাণ্ড হোটেল। তখন দেশী থিয়েটারের চলন ছিল না মোটেই। একদিন ডিভ্‌কারসন সাহেব, বোধ হয় আমেরিকান, সেই সাহেব করলে কী, কোনো একটা পাবলিক থিয়েটারে বাঙালিবাবু সেজে বাঙালিদের ঠাট্টা করে গান করলে। I very good Bengali Babu, গানের প্রথম লাইনটা ছিল এই। তখন অক্ষয় মজুমদার আর অর্ধেন্দু মুস্তফি দুইজনে তার পাল্টা জবাব দিলে কোরিন্‌থিয়ান থিয়েটারে, সাহেবদের একেবারে নিকেশ করে দিলে। সেই প্রথম পাবলিক থিয়েটারে আমাদের জানাশোনা এই দুইজন বাঙালি নামেন। অর্ধেন্দু মুস্তফি খুব নাম-করা অ্যাক্টর ছিলেন, বিশেষ ভাবে কমিকে। তার পর শুনেছি, এও চোখে দেখি নি, মাইকেল মধুসূদনের নাটক শর্মিষ্ঠা অভিনয় হল পাথুরেঘাটায়।

এখন আমাদের বাড়ির নাটকের সূচনা এই, বাবামশায় তখন ছোটো। বাবামশায়, জ্যোতিকাকামশায় ও কৃষ্ণবিহারী সেন

এক স্কুলে পড়েন। আর্ট স্কুলেরও প্রথম ছাত্র ওঁরা। আমাদের বাড়ির একতলার একটি কোণের ঘরে ওঁরা মতলব করছেন মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয় করবেন। জ্যাঠামশায়ের কানে গেল কথাটা। উনি ছোটো ভাইকে ডেকে পাঠালেন। তখনকার দিনে ছোটো ভাই বড়ো ভাই খুব বেশি কাছাকাছি আসতেন না। তা ছোটো ভাই কাছে আসতে বললেন, থিয়েটার করবে সে তো ভালো, তবে কৃষ্ণকুমারী নয়— ও তো হয়ে গেছে পাথুরেঘাটায়। নতুন একটা-কিছু করতে হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দাও, যে বহুবিবাহ সম্বন্ধে একখানা নাটক লিখে দিতে পারবে তাকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখলেন বহুবিবাহ নাটক। একখানা দামী শাল ও পাঁচশো টাকা পুরস্কার পেলেন। নাটকের নাম হল 'নব-নাটক'।

দাদামশায় করেছিলেন 'নববাবুবিলাস', তাঁর ছেলে করলেন নব-নাটক। এই দোতলার হলে থিয়েটার হয়। স্টেজকপিখানা যে কোথায় আছে জানি নে, তার মধ্যে কে কী পার্ট নিয়েছিলেন সব লেখা ছিল। তবু যতটা মনে পড়ে বলছি। নট সেজেছিলেন ছোটো-পিসেমশায়, নীলকমল মুখোপাধ্যায়। নটী জ্যোতিকাকামশায়। তখনকার থিয়েটারে নট-নটী ছাড়া চলত না। কৌতুক— মতিলাল চক্রবর্তী, ছোটোপিসেমশায়ের আপিসের লোক ছিলেন তিনি। গবেশবাবু, নাটকের নায়ক, যিনি তিন-চারটে বিয়ে করেছিলেন, অক্ষয় মজুমদার নিয়েছিলেন সেই পার্ট। গবেশবাবুর তিন স্ত্রীর পার্ট নিয়েছিলেন যথাক্রমে মণিলাল মুখুজ্জে, ছোটো পিসেমশায়ের ছোটো ভাই, আমাদের মণি খুড়ো— বিনোদ গাঙ্গুলি— তাঁরা তখন ছোকরা— আর বড়ো স্ত্রী সেজেছিলেন ও-বাড়ির সারদা পিসে-মশায়। হারমোনিয়াম বাজাতেন জ্যোতিকাকামশায়। তার আগে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান হয় নি, এই প্রথম হল। নয় রাত্তির ধরে

সমানে থিয়েটার হয়েছিল। সাহেবস্থবো, শহরের বড়ো বড়ো লোক সবাই এসেছিলেন। বাড়ির মেয়েদের তখন বাইরে বের হবার নিয়ম ছিল না। তখনকার দিনে দস্তুরই ছিল ওই। মার কাছে শুনেছি বাবা-মশায়রা যখন বাগানে বসতেন, কাছাকাছি জানালায় গিয়ে উঁকি দেওয়া বা দাসদাসীর ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখা, এ-সব ছিল অসভ্যতা। বাইরের পুরুষ বাড়ির মেয়েদের দেখবে এ বড়ো নিন্দের কথা। তা, থিয়েটার হবে হলে, পাশের ঘরে ঘুলঘুলি দিয়ে বাড়ির মেয়েরা থিয়েটার দেখতেন। দুটি ঘুলঘুলি মাত্র ছিল সেখানে, তার একটিতে খাটাল জুড়ে বসতেন কর্তাদিদিমা আর-একটি ঘুলঘুলি দিয়ে বাড়ির অন্য মেয়েরা ভাগাভাগি করে দেখতেন। নয় রাত্তির সমানে কর্তা-দিদিমা থিয়েটার দেখেছেন। মা বলতেন, মাকে আবার কর্তাদিদিমা একটু বেশি ভালোবাসতেন, মা যশোরের মেয়ে ছিলেন; তার উপরে ছোট্ট বউটি। কর্তাদিদিমা মাকে ডেকে বলতেন, আয়, তুই আমার কাছে বোস। ব'লে মাকে কোলে টেনে নিয়ে বসিয়ে থিয়েটার দেখাতেন। মা বলতেন, নয় তো আমার থিয়েটার দেখা সম্ভব হত না। সেই মার কাছেই সব বর্ণনা শুনেছি থিয়েটারের। তিনি বলতেন, সে যে কী সুন্দর নট-নটী হয়েছিল, নট-নটী দেখলেই লোকের চিত্তির হয়ে যেত, কে বলবে যে নটী মেয়ে নয়।

নটী আসল মুক্তোর মালা হীরের গয়না পরেছিলেন। সেই নট-নটী আবার তামাসা করে বাগানময় ঘুরে বেড়ালেন।

পাশের বাড়ির চাটুজ্জেমশায় ছিলেন বেজায় গোঁড়া, তিনি তো রেগে অস্থির। বলেন, এ কী ব্যাপার, মেয়েরা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আর তো মান থাকে না, বলো গিয়ে ও বাড়িতে। তাঁকে যত বোঝানো হয় যে ও-বাড়ির জ্যোতিদাদা মেয়ে সেজেছে, তিনি বলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে।

জ্যোতিকাকা ছিলেন পরম সুন্দর পুরুষ। নটী সাজবেন,

সকাল থেকে বাড়ির মেয়েরা বিনুনি করছে, চুল আঁচড়ে দিচ্ছে গোলাপ তেল দিয়ে, বাড়ির পিসিমারাই সাজিয়ে দিয়েছিলেন ভিতর থেকে।

আর-একদিন নটী থিয়েটারের ভিতরে বসে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন, এমন সময় বেলী সাহেব ঢুকেছেন গ্রীনরুমে কাকে যেন অভিনন্দন করতে। ঢুকেই তিনি পিছু হটে এলেন, বললেন—জেনানা আছেন ভিতরে। শেষে যখন জানলেন জ্যোতিকাকামশায় নটী সেজে বসে বাজাচ্ছেন তখন হাসির ধুম পড়ে গেল। বলেন, কী আশ্চর্য! একটুও জানবার জো নেই, ঠিক যেন জেনানা বলে ভুল হয়।

সিনও যেখানে যেমনটি দরকার, পুকুরঘাট, রাস্তা, স্টেজ-আর্ট যতটুকু রিয়ালিস্টিক হতে পারে হয়েছিল। একটা বনের দৃশ্য ছিল, বাবামশায়ের ছিল বাগানের শখ, আগেই বলেছি। অন্ধকার বনের পথ, বাবামশায় মালীকে দিয়ে চুপি চুপি অনেক জোনাক পোকা জোগাড় করিয়েছিলেন, সেই বনের সিন এলেই বাবামশায় অন্ধকার বনপথে জোনাক পোকা মুঠো মুঠো করে ছেড়ে দিতেন ভিতর থেকে। মা বলতেন, সে যা দৃশ্য হত। বাবামশায় অমনি করে ফাইনাল টাচ দিয়ে দিতেন।

আমি তখন হই নি, দাদা বোধ হয় ছয় মাসের। আর কয়েকটা বছর আগে জন্মালে তোমাকে এই থিয়েটার সম্বন্ধে শোনা গল্প না বলে দেখা গল্পই বলতে পারতুম। বাড়ির জলসা শেষ হয়ে তখনো গল্প চলছে নব-নাটক সম্বন্ধে আমাদের আমলে। সেই গল্পের মধ্যে একটা গান আমার এখনো মনে পড়ে শ্রীনাথ জ্যাঠামশায় সুর দিয়েছিলেন তাতে—

মন যে আমার কেমন করে।
বলি কারে, বলি কারে।

বিরহিণী বউ ঘাটে জল আনতে গিয়ে গাইছে।

সেই থিয়েটারে নবীন মুখুজ্জে মশায়ের ঘণ্টা দেওয়ার একটা মজার গল্প আছে। থিয়েটারে লোকজন আসবে, বাড়ির অন্যান্য সব ছেলেদের এক-একজনের উপর এক-একটা ভার তাঁদের রিসেপশন করবার। নবীনবাবু নির্মলের দাদামশায়, তাঁর উপরে ভার ছিল ঘণ্টা বাজাবার। একদিন হয়েছে কী, থিয়েটার হচ্ছে, নবীনবাবু সময়মত ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছেন। ইণ্টারভাল হল, দশ মিনিট বিশ্রাম। ও ঘরে থিয়েটার, পাশের ঘরে সাপারের ব্যবস্থা। ইণ্টারভালে সবাই এসেছেন এ-ঘরে খেতে, ও-ঘরে নবীনবাবু ঘড়ি হাতে নিয়ে ঘণ্টা ধরে সোজা দাঁড়িয়ে। দশ মিনিট হয়েছে কি ঢং ঢং করে দিলেন ঘণ্টা পিটিয়ে, সাহেবসুবোরা ও অন্য অভ্যাগতরা কেউ হয়তো খেতে শুরু করেছেন কি করেন নি, সবাই দে ছুট। জ্যাঠামশায় বলেন, ব্যস্ত হবেন না, আপনারা নিশ্চিন্ত মনে খান, আপনাদের খাওয়া শেষ হলে আবার থিয়েটার শুরু হবে। জ্যাঠামশায় নীচে গিয়ে নবীনবাবুকে বলেন। নবীনবাবু অমনি বুকপকেট থেকে ঘড়ি বের করে বললেন, দেখো বাবা, দশ মিনিটের কথা, দশ মিনিট হয়ে গেছে কিনা— আমি পাঙ্চুয়ালি ঘণ্টা দিয়েছি।

শেষে জ্যাঠামশায় অনেক বুঝিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন।

অক্ষয় মজুমদার প্রায়ই আসতেন ইদানীং দীপুদার কাছে। তাঁর কাছে গল্প শুনেছি। তিনি বলতেন, জানো ভাই, থিয়েটার তো হচ্ছে, শহরে হৈ-হৈ ব্যাপার। রাস্তা দিয়ে আসছি একদিন, এক বৃদ্ধ আমাকে ধরে পড়লেন ; বললেন, যে করে হোক আমাকে একখানা টিকিট দিন। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, থিয়েটারের এত নাম শুনছি, হারমোনিয়াম বাজনা হবে, আমাকে একখানা টিকিট জোগাড় করে দিতেই হবে। কী আর করি, তাঁকে তো একখানা টিকিট দিলুম কোনোমতে জোগাড় করে। তিনি এসে থিয়েটার দেখে গেলেন, আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

তার পরদিন রাস্তা দিয়ে থেলো হুঁকো টানতে টানতে আসছি, পথে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা; তিনি নিমতলার ঘাটে সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন। আমি বললুম, কেমন দেখলেন থিয়েটার। বৃদ্ধ একেবারে চেঁচিয়ে উঠলেন; বললেন, যা যা, তোর মুখদর্শন করতে নেই। যা যা, পাপিষ্ঠ কোথাকার, সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে তোর মুখদর্শন করতে হল; সরে যা, সরে যা, কথা কবি নে। এই বলে যা-তা ভাষায় আমাকে গালাগালি দিতে লাগলেন। আমি তো ভেবে পাই নে কী হল। বৃদ্ধ বললেন, পাপিষ্ঠ, শেষটায় বউটাকে মেরে ফেললি, তোর নরকেও স্থান হবে না।

থিয়েটারে ছিল গবেশের এক বউ গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়। বৃদ্ধ তখনো সেই অভিনয়ে মশগুল হয়ে আছেন, ভাবছেন সত্যিই গবেশবাবু বউকে মেরে ফেলেছে। মার মুখেও শুনেছি যে অভিনয় দেখে সত্যি বলে ভ্রম হত।

তার পর আমাদের ছেলেবেলায় যেটুকু মনে পড়ে—'কিঞ্চিৎ জলযোগ', যাতে একটা পার্ট ছিল পেরুরামের, জ্যোতিকাকার লেখা। বাবামশায়ও তাতে ছিলেন। তার একটা গান আর হাসির হুর্‌রা আমার এখনো কানে ভাসছে—

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে—
ও বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।

সে কী হাসির ধুম! প্রাণখোলা হাসি, আজকের দিনে অমন হাসি বড়ো 'মিস' করি। হাসতে জানে না লোকে। তাঁদের ভিতরে অনেক দুঃখ, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ছিল মানি, কিন্তু হাসতেন যখন— ছেলেমানুষের মতো প্রাণখোলা হাসি। শুনে মনে হত যেন কোনো দুঃখ কখনো পান নি।

তার পরে আসবে আমাদের কথা।

তখনকার কালের নাটকের সূত্রপাতের কথা তো বলেছি, নাট্য-জগতে তখন দীনবন্ধু মিত্তিরের প্রতাপ। তাঁর 'নীল-দর্পণ' প্রসিদ্ধ নাটক। সেই নাটক হবার পর থেকেই নীলকর সাহেবরা উঠে গেল। পাদ্রী লং সাহেব তার ইংরেজি অনুবাদ করে জেলে যান আর কী। মকদ্দমা, মহা হাঙ্গামা। শেষে কালী সিং, যিনি বাংলায় মহাভারত লিখেছিলেন, তিনি লক্ষ টাকা জামিনে লং সাহেবকে ছাড়িয়ে আনেন। সে অনেক কাণ্ড। তার পর দীনবন্ধু মিত্তিরের 'সধবার একাদশী', আরো অনেক নাটক, সে-সব হয়ে তাঁর পালা শেষ হয়ে গেল। কালী সিংহের 'হুতুম পেঁচার নকশা', টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' পুরোনো সমাজকে চতুর্দিক থেকে আঘাত করছে। বঙ্কিম তখন সাহিত্যজগতে উদীয়মান লেখক। তখন ন্যাশনাল আর বেঙ্গল দুটো পাবলিক স্টেজ হয়ে গেছে।

এলেন নাট্যজগতে জ্যোতিকাকামশায়। 'অশ্রুমতী' নাটক লিখেছেন, থিয়েটার হবে পাবলিক স্টেজে বাইরের লোক দিয়েই। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়, চাকর কোলে করে নিয়ে বেড়ায়। তখনকার দু-এক বছর কত তফাত, বাড়তির সময় কিনা বয়সের। থিয়েটারে শরৎবাবু সত্যিকার ঘোড়ায় চেপে স্টেজে উঠলেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার তখন, একটা হল্লোড় পড়ে গেছে চারি দিকে। নানা রকম গল্পই কানে আসে, চোখে আর দেখতে পাই নে। পড়বারও তখন ক্ষমতা হয় নি যে বইটা পড়ে গল্প শুনব। নানা রকম এটা ওটা কানে আসছে, আর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মার কাছে গল্প শুনি, এই রকম সব ব্যাপার হচ্ছে। অশ্রুমতী অভিনয় হল, বাড়ির মেয়েরা কেউ দেখতে পেলেন না। তখন পাবলিক স্টেজে গিয়ে মেয়েরা দেখবে, এ দস্তুর ছিল না। কী করা যায়। বাবামশায় বললেন, পুরো বেঙ্গল থিয়েটার এক

রাতের জন্য ভাড়া নেওয়া হোক। কেবল আমাদের বাড়ির লোক-জন থাকবে সেদিন। অ্যাক্‌টাররা ছাড়া বাইরের লোক আর-কেউ থাকবে না।

সেই প্রথম মেয়েরা ছাড়া পেলে পাবলিক স্টেজে থিয়েটার দেখতে। ছয় বছরের শিশু আমার মতো, আর অনেক বুড়িদেরও সেই প্রথম থিয়েটার দেখা। অনেক টাকা খরচ করে এক দিনের জন্য স্টেজ ভাড়া করা হল; বেঞ্চিটেঞ্চি নয়, ও-সব সরিয়ে বাড়ির বৈঠকখানা থেকে আসবাবপত্র নিয়ে হল্‌ সাজানো হল। নীচে কার্পেট পেতে ইজি-চেয়ার, ফুলের মালা, আলবোলা; মেয়েদের জন্য চিকের ব্যবস্থা— ঠিক যেন আটচালা সাজানো হয়েছে। স্টেজের অডিটরিয়াম ঘর হয়ে গেল। ছোটোদিদিমা ত্রিপুরা-সুন্দরী আছেন, বাড়ির ছেলেমেয়ে কেউ বাদ যাবে না, সবাই যাবে— আমরাও অনুমতি পেলুম থিয়েটার দেখবার। ঘর হয়ে গেছে, ঘরে বসে দেখব, আপত্তির কী আছে। সবাই গেছি, রামলাল চাকর আমাকে স্টেজের বাঁ দিকে প্রথম 'রো'তে— 'রো' বলে কিছু ছিল না, আমাদেরই চেয়ার দিয়ে সাজানো হয়েছিল ঘর— তবু .রামলাল আমাকে স্টেজের সামনেই বসিয়ে দিলে, ছোটো ছেলে ভালো করে দেখতে পাব। কালীকেষ্ট ঠাকুরের দুই মেয়েও ছিলেন আমার পাশে। বড়ো হয়েও এই সেদিনও সেই থিয়েটার দেখার গল্প হত আমাদের; বলতেন, মনে আছে আমাদের থিয়েটার দেখা? আমি বলি, মনে নেই আবার— যা চিমটি কেটেছিলে পাশে বসে!

বসে আছি, ড্রপসিন পড়ল, তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা। রাজপুত্তুর নৌকোতে চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, পিছনে পাহাড়ের সার— গ্রীক-যুদ্ধের একটা কপি। কোনো সাহেবকে দিয়ে আঁকিয়েছিল বোধ হয়, প্রকাণ্ড সেই ছবি। নৌকো থেকে গোলাপ ফুলের মালা ঝুলছে, কী ভালো যে লাগছে, তন্ময় হয়ে দেখছি।

সিন উঠল। ভামশা মন্ত্রী ইয়া লম্বা দাড়ি, রাজপুত্তুর, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, তলোয়ারের ঝক্‌মকানি, হাসিকান্না— ডুবে গেছি তাতে।

অভিনয় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কথা মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। মলিনা সেজেছিল সুকুমারী দত্ত। স্টেজ-নাম ছিল গোলাপী, সে যা গাইত! বুড়ো বয়সেও শুনেছি তার গান, চমৎকার গাইতে পারত। মিষ্টি গলা ছিল তার, অমন বড়ো শোনা যায় না। আর কী অভিনয়, এক হাতে পিদিমটি ধরে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে আসছে, যেন ছবিটি— এখনো চোখে ভাসছে। পৃথ্বীরাজ আর মলিনার গান, এখনো কানে বাজছে সে সুর—

এ সুখ-বসন্তে সই কেন লো এমন
আপন-হারা বিবশা—

ওইটুকু ছেলের মন একেবারে তোলপাড় করে দিলে। ভীল সর্দার সেজেছিলেন অক্ষয় মজুমদার। 'এ চেনী বুড়ি' বলে যখন অশ্রুমতীর থুঁতি ধরে আদর করছে, তা ভুলবার নয়। আর ভীলদের মতো সেজে, মাথায় পালক গুঁজে তীরধনুক নিয়ে সে যা নাচলেন, আর গাইলেন—

ক্যায়্‌সে কাহারোয়া জাল বিনুরে,
জাল বিনু জাল বিনু জাল বিনু রে।
দিনকো মারে মছলি, রাতকো বিনু জাল,
আর অ্যায়্‌সা দেক্‌দারী কিয়া জিয়া কি জঞ্জাল।

এই বলে অক্ষয়বাবুর নৃত্য, এই নৃত্যতেই ছোটো ছেলের মন একেবারে জয় করে নিলেন। সেই থেকে আমি তাঁকে কমিক অভিনয়ে গুরু বলে মেনে নিলুম। আমি নিজে চিরকাল কমিক পার্টই নিতুম, অভিনয়ে তাই আমার ভালো লাগত। রবিকাকাও বেছে বেছে যাতে একটু কমিক ভাব আছে সেই-সব পার্ট আমাকে দিতেন। অ্যাক্‌টিং মনটায় সেই অক্ষয়বাবু ছায়াপাত করলেন। আমিও অভিনয় করবার সময় অক্ষয়বাবুর কথা স্মরণ করে তাঁর নকল করি।

অশ্রুমতীও বেশ ভালো অভিনয় করেছিল। প্রতাপ সিংহের অভিনয়, বাদশার ছেলে সেলিমের অভিনয়, সব যেন সত্তিসত্ত্যিই রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে, অভিনয় বলে মনেই হচ্ছে না। অশ্রুমতীর অগ্নিপ্রবেশ, সেলিমকে বিদায় দিচ্ছে—

প্রেমের কথা আর বোলো না
আর বোলো না,
আর বোলো না, ক্ষমো গো ক্ষমো,
ছেড়েছি সব বাসনা।
ভালো থাকো, সুখে থাকো হে,
আমারে দেখা দিয়ো না, দেখা দিয়ো না।
নিবানো অনল জ্বেলো না॥

হু হু করে আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। অশ্রুমতীর এই গানে সব মাত করে দিলে। এই গানটায় সুর দিয়েছিলেন জ্যোতিকাকা, ইটালিয়ান ঝিঁঝিট। রবিকাকাও কয়েকটা গানে তখন সুর দিয়েছিলেন বোধ হয়। বিলিতি সুরে বাংলা গান, এখন মজা লাগে ভাবতে। কোত্থেকে যে সুর সব জোগাড় করেওছিলেন। এই-সব স্তব্ধ হয়ে দেখছি, অন্য জগতে চলে গেছি। অশ্রুমতী নাটকে না ছিল কী! আর কী রোমান্টিক সব ব্যাপার! মুখে কথাটি নেই, স্থির হয়ে দেখছি, হঠাৎ একটা জায়গায় খটকা লাগল।

অভিনয় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, অশ্রুমতী বেশ ভালো অভিনয়ই করেছিল, কিন্তু ওমা, তার পায়ের দিকে চেয়ে দেখি বকলস-দেওয়া বার্নিশ-করা জুতো! অশ্রুমতী হল রাজপুত রমণী, তার পায়ে এ জুতো কী! তবে তো এ আসল নয়, ওই একটুখানি সাজের খুঁতে এত যে ইলিউশন সব ভেঙে গেল।

এই প্রথম আমার স্টেজে দেখা নাটক। তার পর বাড়ি এসে আমরা ছেলেরা কয়েক দিন অবধি কেবলই অশ্রুমতীর নাটক করছি নীচের বড়ো ঘরটিতে। কথাগুলো সব ওই এক দিনের দেখাতেই মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

জ্যোতিকাকামশায়ের ‘সরোজিনী’ নাটকের যাত্রা হয়েছিল, যাত্রাওয়ালারা সেই যাত্রা করে। আমাদের বাড়ির উঠোনে একদিন যাত্রা দেখানো হয়েছিল। আমার মনে আছে, চিতোরের পদ্মিনী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
আগুনে সঁপিবে বিধবা বালা।

আর ভৈরবী যখন দু হাত তুলে খাঁড়া হাতে ‘ম্যয় ভুঁখাহুঁ’ বলে বের হত তখন আমাদের বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করে উঠত। জ্যোতিকাকামশায়ের সরোজিনী নাটকের পদ্মিনীর অগ্নিপ্রবেশের ছবি আর্ট স্টুডিয়ো থেকে লিথোগ্রাফ প্রিণ্ট হয়ে বেরিয়েছিল, ঘরে ঘরে সেই ছবি থাকত। দাদামশায়ের থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, জ্যোতিকাকামশায়ে এসে ঠেকল। তখন জ্যোতিকাকামশায় নাট্যজগতে অদ্বিতীয়, অপ্রতিহত প্রতাপ তাঁর বইয়ের। বাজার ছেয়ে গিয়েছিল তাঁর বইয়ে বইয়ে। জায়গায় জায়গায় তাঁর নাটক অভিনয় হত। রবিকাকা তখন কোথায়। তখনো তিনি আসরে কল্কে পান নি।

আমাদের বাড়িতে নাটকের প্রথম ইতিহাস হল— নবনাটকের বেলা অন্য লোকে বই লিখলেন, আমাদের বাড়ির লোকে প্লে করলেন। অশ্রুমতীর বেলা আমাদের বাড়ির লোকে বই লিখলেন, বাইরের লোকে প্লে করলেন। তার পরে হল রবিকাকার আমলে আমাদের ঘরের লোক লিখলেন, আমরাই ঘরের ছেলেমেয়েরা অভিনয় করলুম। এবারে আসবে সে গল্প।

৯

প্রথম বাড়িতে প্লে আরম্ভ হল জ্যোতিকাকামশায়ের প্রহসন ‘এমন কর্ম আর করব না’; ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ ইত্যাদি। জ্যাঠামশায় পার্ট নিয়েছিলেন। সত্যসিন্ধুর। ‘মানময়ী’ও হয়েছিল। মানময়ী যে

কার লেখা তা মনে নেই, কিন্তু গানের সুর জ্যোতিকাকার দেওয়া, ইংরেজি রকমের। এই সুরের অনেক আভাস 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তেও আছে। তখন ওই রকম ছোটোখাটো প্রহসনই হত বাড়িতে বড়োদের নিয়ে। ছোটোরা তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারত না। এ বাড়ির খড়খড়ি টেনে দীপুদার নীচের বৈঠকখানা বেশ দেখা যায়। আমরা সেই খড়খড়ি টেনে মাঝে মাঝে দেখতুম, মা-পিসিমারাও রাত-বিরেতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। রাত্রির অন্ধকারে কে আর আমাদের দেখতে পাচ্ছে।

বঙ্কিমবাবুও আসতেন সে সময়ে। একদিন দেখি বঙ্কিমবাবু মাথায় পাকানো চাদরের পাগড়ি বেঁধে লাঠি ঘুরিয়ে কী যেন করছেন। আর তাঁর চেহারাও ছিল অতি সুন্দর। ওই তাঁর এক রূপ আমার মনে আছে। ও-সব ছিল নিছক বৈঠকখানার ব্যাপার।

তার পর ওঁরা বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় করলেন, তখন বাড়ির মেয়েদের ডাক পড়ল। ঋতুকে ছেলে সাজানো হল। প্রতিভাদিদি সরস্বতী সাজলেন, রবিকাকা সাজলেন বাল্মীকি ঋষি। সারদা-পিসেমশায়, কেদারদাদা, অক্ষয়বাবু, এঁরা সব সেজেছিলেন বড়ো বড়ো ডাকাত। থেকে থেকে বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় হয়। আমরা আর দেখতে পাই নে— ওই যে বললুম, ছোটোদের বড়োদের কাছে ঘেঁষবার হুকুম ছিল না।

একদিন বাবামশায় পার্টি দেবেন, খাওয়া-দাওয়া হবে, লোক-জনদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে, তাতে বাল্মীকিপ্রতিভাও অভিনয় হবে। মহা ধুমধাম। তেতলার ছাদ চার দিকে রেলিং আর পিলপে দেওয়া, ঘেরা, তারই উপরে চালা বেঁধে স্টেজ তৈরি হল। তখন তো ইলেকট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাসের বাতির ব্যবস্থা হয়েছে। সমাজ থেকে হারমোনিয়াম আনা হল। আমরা সকাল থেকে সারদাপিসেমশায়কে ধরেছি একবার আমাদের জন্য দরবার

করতে, অভিনয় দেখব। সারা দিন তাঁর পিছু পিছু ঘুরছি, ও বাড়ির বারান্দায় পিসেমশায়কে দেখলেই এ বাড়ি থেকে দু হাত কচলে আমাদের আবেদন জানাই। তিনি বলেন, হবে হবে। এই করতে করতে অনেক কষ্টে প্রায় বিকেলবেলা পেয়ে গেলুম অনুমতি। সারদাপিসেমশায় বললেন, হয়েছে, তোমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে, আজ দেখতে পাবে তোমরা।

আমাদের উৎসাহ দেখে কে। সরলা তখন ছোটো, সে আমাদের দলেই। আমরা বিকেল থেকে জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে আছি, বিকেলের জলখাবার কোনো রকমে একটু মুখে দিলুম। তখন কি আমাদের খিদেতেষ্টার দিকে মন আছে। অভিনয় হবে রাত সাতটা-আটটার সময়ে, আমরা ছয়টা থেকে তৈরি হয়ে আছি। হবি তো হ, ছয়টার পর থেকেই হঠাৎ ঝঞ্ঝাবাত, দারুণ ঝড় শুরু হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী বৃষ্টি, মনে হল যেন বাড়ি পড়ে যায় আর কী। খোল্ খোল্, পাল-দড়িদড়া কাট্, স্টেজ পড়ে যায়; শোভারাম দারোয়ান দড়িদড়া কাটতে গিয়ে পাল-চাপা পড়ল। গ্যাসের চাবি আর কেউ বন্ধ করতে পারে না, ঝড়ে বৃষ্টিতে সব একাকার। ঘণ্টা দুই চলল অমনি, আমরা তো হতাশ হয়ে পড়লুম। হল আর আমাদের অভিনয় দেখা।

বৃষ্টি থামলে সেই দড়িদড়া এনে নীচের বড়ো ঘরে স্টেজ বাঁধা হল, বারান্দায় হল খাবার ব্যবস্থা। আমাদের কি বের হতে দেয় আর। মনের দুঃখে কী আর করি, এত করে দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছিল, গেল সব পণ্ড হয়ে। সে রাত্রে হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাল্মীকিপ্রতিভা-অভিনয়, অতিথিরাও এলেন, খাওয়া-দাওয়া করলেন। সবই হল, কেবল আমাদের কপালেই অভিনয় দেখা হল না।

সব চুকেবুকে গেছে, অতিথিরা সবাই চলে গেছেন। এখন, দেখা গেল হারমোনিয়াম ভর্তি জল, কাঠ ফেঁপে তার বেঁকে সব

একাকার। বেশ বড়ো হারমোনিয়াম ছিল দুথাক-ওয়ালা। উপরের থাকে পিয়ানো, নীচের থাকে অর্গান। জ্যোতিকাকা এক হাতে পিয়ানো বাজাতেন, এক হাতে অর্গান। সেই হারমোনিয়ামটা আনা হয়েছিল সমাজ থেকে, এখন উপায়? বাবামশায় জ্যোতিকাকামশায়দের ভয় হল সমাজের হারমোনিয়াম খারাপ হয়ে গেছে, কর্তা শুনলে আর রক্ষে নেই। তখন তাঁরা সব বড়ো বড়ো, তবুও কর্তাকে কত ভয় সমীহ করতেন দেখো।

কী উপায়। বাবামশায় বললেন, দেখো কর্তার কানে যেন না যায় কথাটা।

পরদিনই বাবামশায় হেরল কোম্পানির থেকে আর-একটা সেইরকম হারমোনিয়াম কিনে এনে সমাজে দিয়ে তবে নির্ভয় হলেন। সেই হারমোনিয়াম এখনো আছে সমাজে।

তখন 'এমন কর্ম আর করব না' আর 'বাল্মীকিপ্রতিভা' এই দুটো অভিনয় থেকে থেকে হত। একবার ওটা একবার এটা।

সেবার মেজোজ্যাঠামশায় বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন, বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় হবে। এবারে একটু অদল-বদল হয়ে গেল। হ. চ. হ. এলেন সেবারে, তাঁর উপরে ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার। কোত্থেকে দুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন, ক্রৌঞ্চমিথুন হল। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সিন আঁকলেন কচুবনে বন্য বরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা বরাহ কি ছাগল ঠিক বোঝা যায় না। আর বাগান থেকে বটের ডালপালা এনে লাগিয়ে দিলেন। রবিকাকা 'জীবনস্মৃতি'তে পুকুরধারে যে বটগাছের কথা লিখেছেন তা পড়েছ তো? সেই বটগাছ আধখানা হয়ে গেল বারে বারে বাল্মীকিপ্রতিভার স্টেজের সাজ জোগাড়ে। যখনই স্টেজ হত, বেচারা বটগাছের উপরে কোপ, তার পরে যেটুকু বাকি ছিল একদিন ঝড়ে সেটুকুও গেল পুবদিকের আকাশ শূন্য করে।

এই রকম তখনকার স্টেজ, আর রবিকাকা তাতে প্লে করেছেন। ভেবে দেখো কাণ্ডটা। তার পর বাল্মীকিপ্রতিভার গান একটু ভেঙেটেঙে 'কালমৃগয়া' হল। জ্যোতিকাকা সাজলেন রাজা দশরথ, রবিকাকা অন্ধমুনি, ঋতু অন্ধমুনির ছেলে। এই কালমৃগয়াতে প্রথম বনদেবীর পার্ট শুরু হয়। ছোটো ছোটো মেয়ে যারা গাইতে পারে তারা বনদেবী সেজে স্টেজে নামত, ঘুরে ঘুরে গান করত। তখন নাচ-টাচ ছিল না তোমাদের মতো দুম্‌দাম্‌ করে। ওই হাতমুখ নেড়ে গান পর্যন্তই। সেবারে জ্যোতিকাকামশায়ের সত্যিকারের একটা পোষা হরিণ বের করে দেওয়া হল স্টেজে। তখনো স্টেজ-সজ্জায় আমাদের হাত পড়ে নি।

রবিকাকার বিয়ে আর হয় না; সবাই বলেন 'বিয়ে করো—বিয়ে করো এবারে', রবিকাকা রাজী হন না, চুপ করে ঘাড় হেঁট করে থাকেন। শেষে তাঁকে তো সবাই মিলে বুঝিয়ে রাজী করালেন। রথীর মা যশোরের মেয়ে। তোমরা জানো ওঁর নাম মৃণালিনী, তা বিয়ের পরে দেওয়া নাম। আগের নাম কী একটা সুন্দরী না তারিণী দিয়ে ছিল, মা তাই বলে ডাকতেন। সেকেলে বেশ নামটি ছিল, কেন যে বদল হল। খুব সম্ভব, যতদূর এখন বুঝি, রবিকাকার নামের সঙ্গে মিলিয়ে মৃণালিনী নাম রাখা হয়েছিল।

গায়ে হলুদ হয়ে গেল। আইবুড়োভাত হবে। তখনকার দিনে ও বাড়ির কোনো ছেলের গায়ে হলুদ হয়ে গেলেই এ বাড়িতে তাকে নেমন্তন্ন করে প্রথম আইবুড়োভাত খাওয়ানো হত। তার পর এ বাড়ি ও বাড়ি চলত কয়দিন ধরে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন। মা গায়ে হলুদের পরে রবিকাকাকে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন করলেন। মা খুব খুশি, একে যশোরের মেয়ে, তায় রথীর মা মার সম্পর্কের বোন। খুব ধুমধামে খাওয়ার ব্যবস্থা হল। রবিকাকা খেতে বসেছেন উপরে, আমার বড়োপিসিমা কাদম্বিনী দেবীর ঘরে, সামনে আইবুড়োভাত সাজানো হয়েছে—বিরাট আয়োজন।

পিসিমারা রবিকাকাকে ঘিরে বসেছেন, এ আমাদের নিজের চোখে দেখা। রবিকাকা দৌড়দার শাল গায়ে, লাল কী সবুজ রঙের মনে নেই, তবে খুব জমকালো রঙচঙের। বুঝে দেখো, একে রবিকাকা, তায় ওই সাজ, দেখাচ্ছে যেন দিল্লির বাদশা। তখনই ওঁর কবি বলে খ্যাতি, পিসিমারা জিজ্ঞেস করছেন, কী রে, বউকে দেখেছিস, পছন্দ হয়েছে? কেমন হবে বউ ইত্যাদি সব। রবিকাকা ঘাড় হেঁট করে বসে একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছেন, আর লজ্জায় মুখে কথাটি নেই। সে মূর্তি তোমরা আর দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না বললে— ওই আমরাই যা দেখে নিয়েছি।

বিয়ে বোধ হয় জোড়াসাঁকোতেই হল, ঠিক মনে পড়ছে না। বাসিবিয়ের দিন খবর এল সারদাপিসেমশায় মারা গেছেন। ব্যস্, সব চুপচাপ, বিবাহের উৎসব ঠাণ্ডা। কেমন একটা ধাক্কা পেলেন, সেই সময় থেকেই রবিকাকার সাজসজ্জা একেবারে বদলে গেল। শুধু একখানা চাদর গায়ে দিতেন, বাইরে যেতে হলে গেরুয়া রঙের একটা আলখাল্লা পরতেন। মাছমাংস ছেড়ে দিলেন, মাথায় লম্বা লম্বা চুল রাখলেন। সেই চুল সেই সাজ আবার শেষে কত নকল করলে ছোকরা কবির দল।

রবিকাকাকে প্রায়ই পরগনায় যেতে হত। নতুনকাকীমাও মারা গেলেন, জ্যোতিকাকামশায় ফ্রেনোলজি শুরু করলেন, লোক ধরে ধরে মাথা দেখেন আর ছবি আঁকেন। কিছুকাল আমাদের নাটক অভিনয় সব বন্ধ। এ যেন একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমরা বড়ো হয়েছি, স্কুল ছেড়েছি, বিয়েও হয়েছে। আমার আর সমরদার বিয়ের দিন রথী জন্মায়। তার পর এক ড্রামাটিক ক্লাব সৃষ্টি করা গেল। রবিকাকা খাস বৈঠকে ব্রাউনিং পড়ে আমাদের শোনান, হেম ভট্ট রামায়ণ পড়েন। সাহিত্যের বেশ একটা চর্চা হত। নানা রকমের এ বই সে বই পড়া হয়।

একবার ড্রামাটিক ক্লাবে 'অলীকবাবু' অভিনয় হয়। অলীকবাবু

জ্যোতিকাকামশায়ের লেখা, ফরাসী গল্প, মোলেয়ারের একটা নাটক থেকে নেওয়া। সেই ফরাসী গল্প উনি বাংলায় রূপ দিলেন। অত তো পাকা লিখিয়ে ছিলেন, কিন্তু ফরাসী ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। নয়তো হেমাঙ্গিনী কি আমাদের দেশের মেয়ে? এখনকার কালে হলেও সম্ভব ছিল, সেকালে অসম্ভব। এই অবস্থায় আমরা যখন প্লে করি রবিকাকা তো অনেক অদল-বদল করে দিয়ে তা ফরাসী গন্ধ থেকে মুক্ত করলেন। এইখানেই হল রবিকাকার আর্ট। আর করলেন কী, হেমাঙ্গিনীর প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। আগে ছিল এক অলীকবাবুই নানা সাজে ঘুরে-ফিরে এসে বাপকে ভুলিয়ে হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করে। রবিকাকা সেখানে অনেকগুলো লোক এনে ফেললেন। তাতে হল কী, অনেকগুলো কারেক্টারেরও সৃষ্টি হল। হেমাঙ্গিনীকে রাখলেন একেবারে নেপথ্যে। তা ছাড়া তখন মেয়েই বা কই অ্যাকটিং করবার। তাই হেমাঙ্গিনীকে আর বেরই করলেন না। সেবারে লেখায় কতকগুলো এমন মজার 'ডায়লগ' ছিল, সেই স্টেজ-কপির পিছনেই উনি লিখেছিলেন বাড়তি অংশটুকু। ভারি অদ্ভুত অদ্ভুত ডায়লগ সব। অলীকবাবু বলছেন এক জায়গায়, একেবারে তাঁহা তাঁহা লেগে যাবে। তাঁহা তাঁহা মানে কী তা তো জানি নে, কিন্তু ভারি মজা লাগত শুনতে। আরো কত সব এমনিতরো কথা ছিল।

তা, অভিনয় তো হবে, রয়েল থিয়েটারের সাহেব-পেণ্টারকে বলে বলে পছন্দ-মাফিক সিন আঁকালুম। স্টেজ খাড়া করা গেল। নাট্যজগতে সাহিত্যজগতে সেই আমরা এক-এক মূর্তি দেখা দিলুম। রবিকাকা নিলেন অলীকবাবুর পার্ট, আমি ব্রজদুর্লভ, অরুদা মাড়োয়ারি দালাল। রবিকাকার ওই তো সুন্দর চেহারা, মুখে কালিঝুলি মেখে চোখ বসিয়ে দিয়ে একটা অত্যন্ত হতভাগা ছোঁড়ার বেশে স্টেজে তিনি বেরিয়েছিলেন। হেসো না, আমাকে আবার পিসনী দাসীর পার্টও নিতে হয়েছিল। আমার ব্রজদুর্লভের পার্ট

ছিল খুব একটা বখাটে বুড়োর। হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করতে আসছে একে একে এ ও। আমি, মানে ব্রজদুর্লভ, তাদেরই একজন। গায়ে দিয়েছিলুম নীল গাজের জামা-- আমার ফুলশয্যার সিল্কের জামা ছিল সেটা— তখনকার চলতি ছিল ওই রকম জামার। সোনার গার্ড-চেন বুকে, কুঁচিয়ে ধুতির কোঁচাটি কালাচাঁদবাবুর মতো বুক-পকেটে গোঁজা যেন একটি ফুল, হাতে শিঙের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজে ঢুকলুম। একটু-একটু মাৎলামি ভাব। এখন সেই পার্টে আমার একটা গান ছিল, রবিকাকার দেওয়া সুর—

আগে কী জানি বল
নারীর প্রাণে সয় গো এত।
কাঁদাব মনে করি
ছি ছি সখি, কাঁদি তত।

কোত্থেকে যে ও গান জোগাড় করেছিলেন তা উনিই জানেন। আমার গলায় ও সুর এল না। আমি বললুম, ও আমি গাইতে পারব না, ও সুর আমার গলায় আসবে না। রবিকাকা বললেন, তবে তুমি নিজেই যা হয় একটা গাও, কিন্তু এই ধরনের হবে। আমি বললুম, আচ্ছা, সে আমি ঠিক করব'খন।

রাধানাথ দত্ত বলে একটি লোক প্রায়ই এখানে আসতেন, মদটদ খাওয়া অভ্যেস ছিল তাঁর। তাঁর মুখে একটা গান শুনতুম, জড়িয়ে জড়িয়ে গাইতেন আর ছড়ি ঘুরিয়ে চলতেন। আমি ভাবলুম এই ঠিক হবে, আমিও মাথায় চাদর জড়িয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রাধাবাবুর হুবহু নকল করে স্টেজে ঢুকে গান ধরলুম—

আয় কে তোরা যাবি লো সই
আনতে বারি সরোবরে।

এই দুই লাইন গাইতেই চারি দিক থেকে হাততালির উপর হাত-তালি। রাধাবাবুর মুখ গম্ভীর। সবাই খুব বাহবা দিলে। রবিকাকা

মহা খুশি ; বললেন, বেড়ে করেছ অবন, ও গানটা যা হয়েছে চমৎকার! আর সত্যিই আমি খুব ভালো অভিনয় করেছিলুম।

এই নাটকেই প্রথম সেই গানটি হয়, রবিকাকা তৈরি করে দিলেন, আমরা অভিনয়ের পর সবাই স্টেজে এসে শেষ গানটি করি—

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা করছি টলোমল।

গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচও চলেছিল আমাদের। কী যে জমেছিল অভিনয় তা কী বলব। কিন্তু ওই রাধানাথের গানই হল আমাদের কাল। রাধানাথ দত্ত গেলেন খেপে। তিনি বাড়ি বাড়ি, এমন-কি আমার শ্বশুরবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে রটালেন যে ছেলেরা সব বুড়োদের নকল করে তামাশা করেছে। সবাই অনুযোগ-অভিযোগ আনতে লাগলেন। এ তো বড়ো বিপদ হল। কী করে তাঁদের বোঝাই যে আমরা কেউ আর-কারো নকল করি নি। তাঁরা কিছুতেই মানতে চান না। আমাদের মন গেল খারাপ হয়ে। রবিকাকা বললেন, দরকার নেই আর ড্রামাটিক ক্লাবের, এ তুলে দাও। পরের প্লে 'বিসর্জন' হবে, সব ঠিক, পার্ট আমাদের মুখস্থ, সিন আঁকা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ড্রামাটিক ক্লাব তুলে দেওয়া হল। ড্রামাটিক ক্লাব তো উঠে গেল, রেখে গেল কিছু টাকা। আমাদের তখন এই-সব কারণে মন খারাপ হয়ে আছে ; আমি বললুম সেই টাকা দিয়ে ভোজ লাগাও। হল ড্রামাটিক ক্লাবের শ্রাদ্ধ, রীতিমত ভোজের আয়োজন, সে-সব গল্প তো তোমাকে আগেই বলেছি। এই হল ড্রামাটিক ক্লাবের জন্মমৃত্যুর ইতিহাস।

তার পর মেজোজ্যাঠামশায়ের পার্টি, আমরা 'রাজা ও রানী' অভিনয় করেছিলুম। আর কী খাওয়ার ধুম এক মাস ধরে। পার্ট সব তৈরি হয়ে গেছে, তবু আমরা রিহার্সেল বন্ধ করছি না খাওয়ার

লোভে। আমি তখন খাইয়ে ছিলুম খুব। বিকেলের চা থেকে খাওয়া শুরু হত, রাত্রের ডিনার পর্যন্ত খাওয়া চলত আমাদের, আর সঙ্গে সঙ্গে রিহার্সেলও চলত। দেবদত্ত সেজেছিলেন মেজো-জ্যাঠামশায়, সুমিত্রা মেজোজ্যাঠাইমা, রাজা রবিকাকা, ত্রিবেদী অক্ষয় মজুমদার, কুমার প্রমথ চৌধুরী, ইলা প্রিয়ম্বদা, সেনাপতি নিতুদা— যেমনি লম্বা চওড়া ছিলেন স্টেজে ঢুকলে মনে হত যেন মাথায় ঠেকে যাবে। আর, আমরা অনেকেই ছোটোখাটো পার্ট নিয়েছিলুম জনতা, সৈন্য, নাগরিক, এই-সবের। আমার ছয়-ছয়টা পার্ট ছিল তাতে। মেজোজ্যাঠাইমা ডিমেতে ব্রাণ্ডিতে ফেটিয়ে এগ্‌ফ্লিপ তৈরি করে রাখতেন খাবার জন্য, পাছে আমাদের গলা ভেঙে যায়। আমার দরকার হত না এগ্‌ফ্লিপ খাবার, অরুদার থেকে থেকেই গলা খুস খুস করত। বলতেন, অবন, গলাটা কেমন করছে, আর ঘুরে ফিরে কেবল এগ্‌ফ্লিপই খাচ্ছেন।

গাড়িবারান্দায় স্টেজ বাঁধা হল। এক রাত্তিরে ড্রেস রিহার্সেল হচ্ছে, ঘরের লোকই সব জমা হয়েছে। পরের দিন অভিনয় হবে। মেজোজ্যাঠামশায়ের মেজাজ তো, মুখে যা আসত টপাস করে বলে ফেলতেন। এখন, অক্ষয়বাবু ত্রিবেদীর পার্ট করছেন ড্রেস রিহার্সেলে বেশ ভালোই করছিলেন। কিন্তু মেজোজ্যাঠামশায়ের পছন্দ হল না, মেরে দিলেন তিন তাড়া— এ কি কমিক হচ্ছে!

সব চুপ, কারো মুখে কথা নেই, আমরাও থ। মেজোজ্যাঠা-মশায়ের মুখের উপরে কথা বলে কার এত সাহস।

রবিকাকা আমাদের ফিসফিস করে বললেন, দেখলে মেজদার কাণ্ড, হল এবারের মতো অভিনয় করা।

অক্ষয়বাবুর মুখে ঝোড়া নামল। কথা নেই, মুখ নিচু করে বসে রইলেন। খানিক বাদে মেজোজ্যাঠাইমা বললেন, তা, তুমি ওঁকে বলে দাও-না কী রকম করতে হবে। কাল অভিনয় হবে, আজ যদি এ রকম বন্ধ হয় তা হলে চলবে কী করে। তখন

অক্ষয়বাবুও বললেন, হ্যাঁ, তাই বলো কী করে অভিনয় করতে হবে, আমি তাই করছি। এই বলে রবিকাকার দিকে চাইলেন, রবিকাকা একটু চোখ টিপে দিলেন। তিনি আবার বললেন, আমি বুঝতে পারছিলুম যে ঠিক হচ্ছিল না, তা তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও, আমি নাহয় আবার করছি এই পার্ট। অক্ষয়বাবু অতি বিনীত ভাব ধারণ করলেন।

মেজোজ্যাঠাইমা রবিকাকা সবাই বুঝলেন, ব্যাপার সুবিধের নয়, অক্ষয়বাবু এবারে কিছু খসাবেন।

মেজোজ্যাঠামশায় বললেন, করো তা হলে আবার গম্ভীর হয়ে পার্ট করো, এ তো আর হাসিতামাশা নয়।

আবার সেই সিন শুরু হল। আমাদের যাদের সেই সিনে পার্ট ছিল— রবিকাকা আমরা— উঠলুম; সবার পার্ট যে যেমন করি তাই করে গেলুম। অক্ষয়বাবু খুব গম্ভীর মুখে স্টেজে ঢুকলেন; পার্ট বলে গেলেন আগাগোড়া, তাতে না দিলেন কোনো অ্যাক্‌সেণ্ট না কোনো ভাব বা কিছু। সোজা গম্ভীর মুখে গড়গড় করে কথা কয়ে গেলেন। সিংহীকে লেজ কেটে দিলে রোঁয়া ছেঁটে দিলে যেমন হয় ত্রিবেদীর পার্ট ঠিক সেই রূপে দেখা দিল।

মেজোজ্যাঠাইমা মেজোজ্যাঠামশাইকে বললেন, তুমি কেন বলতে গেলে, এর চেয়ে আগেই তো ছিল ভালো।

অক্ষয়বাবু বললেন, আমি সাধ্যমত করেছি, এবার তা হলে আমাকে বিদেয় দাও, বুড়ো হয়ে গেছি, ছেলেছোকরা কাউকে দিয়ে না-হয় এই পার্ট করাও। বলে আমার দিকে চাইতেই আমি হাত নেড়ে বারণ করলুম। লোভ যে ছিল না ত্রিবেদীর পার্ট করতে তা নয়, হয়তো দিলে ভালোই করতে পারতুম।

অক্ষয়বাবু বললেন, আর এখানে রোজ যাওয়া-আসায় আমারও তো একটা খরচ আছে, আমি আর পারি নে।

কী আর করা যায় এখন, এই একদিনের মধ্যে তো নতুন

লোক তৈরি করা সম্ভব নয়। সেই রাত্রে অক্ষয়বাবু নগদ পঞ্চাশ টাকা পকেটে ক'রে— বর্ষা নেমেছে শীত শীত ক'রে একখানা গায়ের চাদর ঘাড়ে ক'রে— বাড়ি ফিরলেন।

সেবার রাজা ও রানী অভিনয় খুব জমেছিল। সবাই যার যার পার্ট অতি চমৎকার করেছিলেন। লোকের যা ভিড় হত। আমার মন খুঁত খুঁত করত বাইরে থেকে দেখতে পেতুম না বলে। ছটা পার্ট ছিল আমার, একটা পার্ট করে পরের সিনে আবার তক্ষুনি তক্ষুনি সাজ বদল করে আর-একটা পার্ট করতে আমার গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যেত। তার উপরে আবার যখন একটু দাঁড়াতুম, সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জের ভাই জিতেন বাঁড়ুজ্জে কুস্তিগীর, বিরাট শরীর, মহা পালোয়ান, সে আমার স্কন্ধে ভর দিয়ে অভিনয় দেখত— আমার ঘাড় ব্যথা হয়ে গিয়েছিল।

একদিন আবার আর-এক কাণ্ড— অভিনয় হচ্ছে, হতে হতে ড্রপসিন পড়বি তো পড়্ একেবারে মেজোজ্যাঠাইমার মাথার উপরে প্রায়। রবিকাকা তাড়াতাড়ি মেজোজ্যাঠাইমাকে টেনে সরিয়ে আনেন। আর-একটু হলেই হয়েছিল আর কী!

রাজা ও রানী বোধ হয় আর অভিনয় হয় নি। পরে, এমারেল্ড থিয়েটার রাজা ও রানী নিয়েছিল। পাবলিক অ্যাক্‌টার অ্যাক্‌ট্রেস অভিনয় করে। গিরিশ ঘোষ ছিলেন তখন তাতে, সে আবার এক মজার ঘটনা। এখন, আমাদের যখন রাজা ও রানী অভিনয় হয় সে সময়ে একদিন কী করে পাবলিক অ্যাক্‌ট্রেসরা ভদ্রলোক সেজে অভিনয় দেখতে ঢুকে পড়ে। আমরা কেউ কিছু জানি নে। আমরা তো তখন সব ছোকরা, বুঝতেই পারি নি কিছু। তারা তো সব দেখেশুনে গেল। এখন পাবলিক স্টেজে রাজা ও রানী অভিনয় করবে, আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। আমরা তো গেছি, রানী সুমিত্রা স্টেজে এল, একেবারে মেজো-জ্যাঠাইমা। গলার সুর, অভিনয়, সাজসজ্জা, ধরনধারণ, হুবহু

মেজোজ্যাঠাইমাকে নকল করেছে। মেয়েদের আরো অনেকের নকল করেছিল, রবিকাকাদের নকল করতে পারবে কী করে। ছেলেদের পার্ট ততটা নিতে পারে নি। কিন্তু মেজোজ্যাঠাইমার সুমিত্রাকে যেন সশরীরে এনে বসিয়ে দিলে। অদ্ভুত ক্ষমতা অ্যাক্‌ট্রেসদের, অবাক করে দিয়েছিল।

রিহার্সেলেই আমাদের মজা ছিল। বিকেল হতে না হতেই রোজ মেজোজ্যাঠামশায়ের বাড়ি যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব, রিহার্সেল, হৈ-চৈ, ওইতেই আমাদের উৎসাহ ছিল বেশি। অভিনয় হয়ে গেলে পর আমাদের আর ভালো লাগত না। কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকত সব। তখন 'কী করি' 'কী করি' এমনি ভাব। রবিকাকা তো থেকে থেকে পরগনায় চলে যেতেন, আমরা এখানেই থাকি— আমাদেরই হত মুশকিল। আর, কত রকম মজার মজার ঘটনাই হত আমাদের রিহার্সেলের সময়ে। সেবারে 'রাজা ও রানী'র রিহার্সেলের সময় আমাদের জমেছিল সব চেয়ে বেশি। ছেলেবুড়ো সব জমেছি সেই অভিনয়ে। অনেক জনতার পার্ট ছিল। বলেছি তো আমাকেই ছ-ছটা পার্ট নিতে হয়েছিল, অত লোক পাওয়া যাবে কোথায়। জগদীশ মামা ছিলেন, তাঁরও উৎসাহ লেগে গেল। জগদীশ মামা ভারি মজার মানুষ ছিলেন, সবারই তিনি জগদীশ মামা। এই জগদীশ মামা, কী রকম লোক ছিলেন শোনো। তাঁর দাদা ব্রজরায় মামা, তিনিও এখানেই থাকতেন, তিনি তবু একটু চালাক-চতুর। তিনি ছিলেন ক্যাশিয়ার। একবার কর্তাদাদামশায় ব্রজরায় মামাকে ফরমাশ করলেন, ভালো তালমিছরি নিয়ে এসো। কর্তাদাদামশায়ের আদেশ, ব্রজমামা তখুনি বাজারে ছুটলেন টাকাকড়ি পকেটে নিয়ে। তিন দিন আর দেখা নেই।

কর্তাদিদিমা ভাবছেন, ভাইয়ের কী হল। কর্তাদাদামশায়েরও ভাবনা হল, তাই তো তিন দিন লোকটার দেখা নেই, সঙ্গে

টাকাকড়ি আছে, কিছু বিপদ-আপদ ঘটল না কি। তখনকার দিনে নানা রকম ভয়ের কারণ ছিল। পুলিসে খবর দিলেন। পুলিস এদিক-ওদিক খোঁজখবর করছে। এমন সময়ে তিন দিন বাদে ব্রজরায় মামা মুটের মাথায় করে মস্ত এক তালমিছরির কুঁদো এনে উপস্থিত।

এখন হয়েছে কী, ব্রজরায় মামা বাজারে ভালো তালমিছরি খুঁজতে খুঁজতে কিছুতেই মনের মতো ভালো তালমিছরি পান না, বাজারেরই কেউ একজন বুঝি বলেছে যে বর্ধমানে ভালো মিছরি পাওয়া যাবে। ব্রজরায় মামা সেখান থেকেই সোজা টিকিট কেটে বর্ধমান চলে গেছেন, সেখানে গিয়ে এ-গাঁ ও-গাঁ ঘুরে তিন দিন বাদে মিছরির কুঁদো এনে হাজির। কর্তাদাদামশায় হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পান না। সেই ব্রজরায় মামার ছোটো ভাই জগদীশ মামা, বুঝে দেখো ব্যাপার।

তা 'রাজা ও রানী'র রিহার্সেল চলছে, রবিকাকা মেজোজ্যাঠাইমা সবাই ধরলেন, জগদীশ মামা তুমিও নেমে পড়ো। একজনই ঘুরেফিরে আসার চেয়ে নতুন নতুন লোকের নতুন নতুন ক্যারেক্টার থাকবে। আমিও খুব উৎসাহী। বললুম, খুব ভালো হবে। জগদীশ মামা বললেন, না দাদা, ভুলেটুলে যাব শেষটায়। আমি বললুম, কিছু ভুল হবে না, সময়মত আমি তোমাকে খোঁচা দেব, পিছন থেকে বলে দেব, তুমি ভেবো না।

এখন জনতার মধ্যে দুটি কথা, আধখানি লাইন বলতে হবে জগদীশ মামার। রবিকাকা আবার বড়ো বড়ো করে লিখে দিলেন। আমরা তাঁকে রিহার্সেল দেওয়ালুম। কথা হচ্ছে জনতার মধ্যে একবার শুধু জগদীশ মামা বলবেন যে 'তা আপনারা পাঁচজনে যা বলেন।' রোজ রিহার্সেলের সময় হলেই আগে থাকতে জগদীশ মামা পার্ট মুখস্থ করতে থাকেন। একে ওকে বলেন, 'দেখো তো ভাই, ঠিক হচ্ছে কিনা, ভুলে যাচ্ছি না তো?' আর রোজই

রিহার্সেলে ওঁর কথা কয়টি বলবার সময় হলেই সব ভুলে যেতেন, আমি এদিক-ওদিক থেকে খোঁচা দিতে থাকতুম, জগদীশ মামা, এবারে বলো তোমার পার্ট। উনি ঘাবড়ে গিয়ে কথাটি ভুলে যেতেন ; বলতেন, 'তা তোমরা যা বলো দাদা, তা তোমরা যা বলো।'

রোজই এই কাণ্ড হতে লাগল। আর সেই জনতার সিনে আমাদের সে যা হাসি। শেষে কোনো রকম করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পার্ট মুখস্থ করানো গেল, কিন্তু পাঁচজনের পাঁচের চন্দ্রবিন্দু তাঁর মুখে আসত না ; বলতেন, 'তা পাচজনে যা বলেন।' তিনি আবার আমাদের গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করতেন, কেমন হল দাদা! আমরা বলতুম, অতি চমৎকার, এমন আর কেউ করতে পারত না। তিনি তো মহা খুশি।

রিহার্সেলে সে যা সব মজা হত আমাদের। রিহার্সেল ছেড়ে প্লেতে আর আমাদের জমত না। যেমন ছবি আঁকা, যতক্ষণ ছবি আঁকি আনন্দ পাই, ছবি হয়ে গেল তো গেল। এও তাই। রবিকাকা তাই পর পর একটা ছেড়ে আর-একটা লিখেই যেতেন। আমরা তো দিনকতক স্টেজেই ঘরবাড়ি করে ফেলেছিলুম। প্ল্যাটফর্ম পাতা থাকত, রোজ দুপুরে তাকিয়া পাখা পানতামাক নিয়ে সেখানেই আখড়াবাড়ির মতো সবাই কাটাতুম। মশগুল হয়ে থাকতুম ড্রামাতে। সে যে কী কাল ছিল। তখন রবিকাকার রোজ নতুন নতুন সৃষ্টি।

তার পর এই বাড়িতেই ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মানিক্যকে 'বিসর্জন' নাটক দেখানো হয়, পুরানো সিন তৈরি ছিল সেই-সব খাটিয়েই। আমাদেরও পার্ট মুখস্থ ছিল। রবিকাকা পার্ট নিয়েছিলেন রঘুপতির, অরুদা জয়সিংহের, দাদা রাজার, অপর্ণা এ বাড়িরই কোনো মেয়ে মনে নেই ঠিক। বালক বালিকা, তাতা আর হাসি, বোধ হয় বিবি আর সুরেন, তাও ঠিক মনে পড়ছে না।

এইখানে একটা ঘটনা আছে। রবিকাকাকে ও রকম উত্তেজিত হতে কখনো দেখি নি। এখন, রবিকাকা রঘুপতি সেজেছেন, জয়সিংহ তো বুকে ছোরা মেরে মরে গেল। স্টেজের এক পাশে ছিল কালীমূর্তি বেশ বড়ো, মাটি দিয়ে গড়া। কথা ছিল রঘুপতি দূর দূর বলে কালীর মূর্তিকে ধাক্কা দিতেই, কালীর গায়ে দড়াদড়ি বাঁধা ছিল, আমরা নেপথ্য থেকে টেনে মূর্তি সরিয়ে নেব। কিন্তু রবিকাকা করলেন কী, উত্তেজনার মুখে দূর দূর বলে কালীর মূর্তিকে নিলেন একেবারে দু হাতে তুলে। অত বড়ো মাটির মূর্তি দু হাতে উপরে তুলে ধরে স্টেজের এক পাশ থেকে আর-এক পাশে হাঁটতে হাঁটতে একবার মাঝখানে এসে থেমে গেলেন। হাতে মূর্তি তখন কাঁপছে, আমরা ভাবি কী হল রবিকাকার, এইবারে বুঝি পড়ে যান মূর্তিসমেত। তার পর উইংসের পাশে এসে মূর্তি আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন। তখনো রবিকাকার উত্তেজিত অবস্থা। জানো তো তাঁকে, অভিনয়ে কী রকম এক-এক সময়ে উত্তেজনা হয় তাঁর। আমরা জিজ্ঞেস করলুম, কী হল রবিকাকা তোমার। ওই অতবড়ো কালীমূর্তি দু হাতে একেবারে তুলে নিলে?

উনি বললেন, কী জানি কী হল, ভাবলুম মূর্তিটাকে তুলে একবারে উইংসের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দেব। উত্তেজনার মুখে মূর্তি তো তুলে নিলুম, ছুঁড়তে গিয়ে দেখি ও পাশে বিবি না কে যেন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে; এই মাটির মূর্তি চাপা পড়লে তবে আর রক্ষে নেই— হঠাৎ সামলে তো নিলুম, কিন্তু কোমর ধরে গেল।

তার পর অতি কষ্টে এ পাশে এসে রবিকাকা কোনেরকম করে মূর্তি নামান। সেই কোমরের ব্যথায় মাসাবধি কাল ভুগেছিলেন।

এর পরে সব শেষে হল 'খামখেয়ালী'। ড্রামাটিক ক্লাব নিয়ে নানা হাঙ্গামা হওয়ায় এবারে রবিকাকা ঠিক করলেন বেছে বেছে গুটিকতক খেয়ালী সভ্য নেওয়া হবে, অন্যান্যরা থাকবেন অভ্যাগত হিসাবে। নাম কী হবে, রবিকাকা ভাবছেন 'খেয়ালী সভা'

'খেয়ালী সভা'। আমি বললুম, নাম দেওয়া যাক খামখেয়ালী। রবিকাকা বললেন, ঠিক বলেছ, এই সভার নাম দেওয়া যাক খামখেয়ালী। ঠিক হল প্রত্যেক সভ্যের বাড়িতে মাসে একটা খামখেয়ালীর খাস মজলিস হবে, আর সভ্যেরা তাতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পড়বেন। প্রত্যেক অধিবেশনের শেষে রবিকাকা একটা খাতায় নিজের হাতে বিবরণী লিখে রাখতেন। সেই খাতাটি আমি রথীকে দিয়েছি, দেখো তাতে অনেক জিনিস পাবে।

খাস মজলিসের কর্মসূচী যতটা মনে পড়ে এইভাবে লেখা থাকত, একটা নমুনা দিচ্ছি—

১৩০৩

স্থান জোড়াসাঁকো।

নিমন্ত্রণকর্তা— শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুষ্ঠান। শ্রীগগনেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' আবৃত্তি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'মানভঞ্জন' -নামক গল্প পাঠ। গোঁসাইজির গান ও তাঁহার দাদার সংগত। গীতবাদ্য।

আহার। ধূপধুনা রসুনচৌকি সহযোগে তাকিয়া আশ্রয় করিয়া রেশমবস্ত্র-মণ্ডিত জলচৌকিতে জলপান।

অভ্যাগতবর্গ। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ
শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন
শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ চৌধুরী
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভ্যাগত আরো অনেকেই ছিলেন— শ্রীযুক্ত উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বর্মা, শ্রীযুক্ত করুণাচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁরা অনেকেই নিমন্ত্রিত হিসেবে আসতেন।

খাস মজলিসে আহারও আমাদের এক-এক বার এক-এক ভাবে সাজিয়ে দেওয়া হত। কোনো বার 'ফরাসে বসিয়া প্লেটপাত্রে

মোগলাই খানা', কখনো 'টেবিলে জলপান', কোনো বার বা 'সাদাসিদে বাংলা জলপান'।

এই খামখেয়ালীর যুগে আমাদের বেশ একটা আর্টের কাল্‌চার চলছিল। নিমন্ত্রণপত্রও বেশ মজার ছিল। একটা স্লেট ছিল, সেটা পরে দারোয়ানরা নিয়ে রামনাম লিখত, সেই স্লেটটিতে রবিকাকা প্রত্যেক বারে কবিতা লিখে দিতেন, সেইটি সভার সভ্য ও অভ্যাগতদের বাড়ি বাড়ি ঘুরত। ওই ছিল খামখেয়ালীর নেমন্তন্ন পত্র। নেমন্তন্নের কয়েকটি কবিতা এখনো আমার মনে আছে।

শ্রাবণ মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার সন্ধ্যাবেলা
সাড়ে সাত ঘটিকায় খামখেয়ালীর মেলা।
সভ্যগণ জোড়াসাঁকোয় করেন অবরোহণ
বিনয়বাক্যে নিবেদিছে শ্রীরজনীমোহন।

আর-একবার ছিল— এ থেকেই বুঝতে পারবে আমাদের খাস-মজলিসে কী কী কাজ হত—

শুন সভ্যগণ যে যেখানে থাকো,
সভা খামখেয়াল স্থান জোড়াসাঁকো।
বার রবিবার রাত সাড়ে সাত,
নিমন্ত্রণকর্তা সমরেন্দ্রনাথ।
তিনটি বিষয় যত্নে পরিহার্য—
দাঙ্গা, ভূমিকম্প, পুণা-হত্যাকার্য।
এই অনুরোধ রেখো খামখেয়ালী,
সভাস্থলে এসো ঠিক punctually।

আরো সব বেড়ে মজার কবিতা ছিল—

এবার
খামখেয়ালীর সভার
অধিবেশন হবার
স্থান কিছু দূরে
সেই আলিপুরে।

নির্মল সেন
সবে ডাকিছেন।
শনিবার রাত
ঠিক সাড়ে সাত।

দাঁড়াও, আরো একটা মনে পড়ছে। দেখো তো, কথায় কথায় কেমন সব মনে আসছে একে-একে। কে জানত আমার আবার এও মনে থাকবে। সেবার এখানেই হয় খামখেয়ালীর অধিবেশন, এই জোড়াসাঁকোতেই—

এতদ্বারা নোটিফিকেশন
খামখেয়ালীর অধিবেশন
চৌঠা শ্রাবণ শুভ সোমবার
জোড়াসাঁকো গলি ৬ নম্বার।
ঠিক ঘড়ি ধরা রাত সাড়ে সাত
সত্যপ্রসাদ কহে জোড় হাত।
যিনি রাজী আর যিনি গররাজী
অনুগ্রহ করে লিখে দিন আজই।

এই-সব কাণ্ডকীর্তি আমাদের হত তখন। আমাকে রবিকাকা বললেন, অবন, তোমাকেও কিছু লিখতে হবে। কিছুতেই ছাড়েন না। আমি খামখেয়ালীতে প্রথম পড়ি 'দেবীপ্রতিমা' বলে একটা গল্প। পুরোনো 'ভারতী'তে যদি থেকে থাকে খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে। রবিকাকা আমাকে প্রায়ই বলতেন, অবন, তোমার সেই লেখাটি কিন্তু বেশ হয়েছিল।

রবিকাকাও সে-সময় অনেক গল্প কবিতা খামখেয়ালীর জন্য লিখেছিলেন। সেই খামখেয়ালীর সময়েই 'বৈকুণ্ঠের খাতা' লেখা হয়। খামখেয়ালীতে পড়া হল, ঠিক হল আমরা অভিনয় করব। কেদার হলেন রবিকাকা, মতিলাল চক্রবর্তী সাজলেন চাকর, দাদা বৈকুণ্ঠ, নাটোরের মহারাজা অবিনাশ, আমি সেই তিনকড়ি ছোকরা। ওই সেবারেই আমার অভিনয়ে খুব নাম হয়। তখন আরো মোটা

লম্বা-চওড়া ছিলুম অথচ ছোকরার মতো চট্‌পটে, মুখেচোখে কথা; রবিকাকা বললেন, অবন, তুমি এত বদলে গেলে কী করে।

একটা বোতাম-খোলা বড়ো ছিটের জামা গায়ে, পানের পিচ্‌কি বুকময়। মা বলতেন, তুই এমন একটা হতভাগা-বেশ কোত্থেকে পেলি বল্‌ তো! এক হাতে সন্দেশের ঝুড়ি, আর-এক হাতে খেতে খেতে স্টেজে ঢুকছি, রবিকাকার সঙ্গে সমানে সমানে কথা কইছি, প্রায় ইয়ার্কি দিচ্ছি খুড়ো-ভাইপোতে। প্রথম প্রথম বড়ো সংকোচ হত, হাজার হোক রবিকাকার সঙ্গে ও-রকম ভাবে কথা বলা, কিন্তু কী করব— অভিনয় করতে হচ্ছে যে। কথা তো সব মুখস্থ ছিলই, তার উপর আরো বানিয়ে টানিয়ে বলে যেতে লাগলুম। রবিকাকা আর থৈ পান না। আমাদের সেই অভিনয় দেখে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন, এ-রকম অ্যাক্‌টার সব যদি আমার হাতে পেতুম তবে আগুন ছিটিয়ে দিতে পারতুম।

একদিন রবিকাকা পার্ট ভুলে গেছেন, স্টেজে ঢুকেই এক সিন বাদ দিয়ে 'কী হে তিনকড়ি' বলে কথা শুরু করে দিলেন। আমি চুপিচুপি বলি, বাদ দিলে যে রবিকাকা, প্রথম সিনটা। তা, তিনি কেমন করে বেশ সামলে গেলেন।

জ্যোতিকাকা করেছিলেন আরো মজার— পার্ক স্ট্রীটে কী একটা প্লে হচ্ছে, স্টেজে ঢুকেছেন, ঢুকে নিজের পার্ট ভুলে গেছেন। তিনি সোজা উইংসের পাশে গিয়ে সকলের সামনেই জিজ্ঞেস করলেন, কী হে, বলে দাও-না আমার পার্টটা কী ছিল, ভুলে গেছি যে।

এই তো গেল নানা ইতিবৃত্ত।

কিছুকাল বাদে খামখেয়ালীও উঠে যায়। কেন যে উঠে যায় তার একটা গল্পও আছে। বলব তোমাকে সব? কী জানি শেষে না আবার বন্ধুমানুষ কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হন। যাক গে, নাম বলব না কারুরই, গল্প শুনে রাখো। আমার আর কয়দিন, যা-কিছু আমার কাছে আছে সব তোমার কাছে জমা দিয়ে যাই। অনেক

কথাই কেউ জানে না, আমি চলে গেলে আর জানবার উপায়ও থাকবে না। দরকার মনে করো যদি জানিয়ো তাদের আমি তোমার কাছে বলেই খালাস ; এর পর তোমার যা ইচ্ছে কোরো।

কী বলছিলুম যেন, খামখেয়ালী উঠে যাবার কথা, কেন উঠে গেল। বলি শোনো।

এখন, কথা ছিল যে প্রত্যেক সভ্যের বাড়ি এক-একবার খামখেয়ালীর খাস মজলিস হবে। মজলিসে কী কী পড়া হবে, কী ভাবে খাওয়ানো, কে গান করবে, বাজনা ইত্যাদি সব-কিছুরই ভার সেই সভ্যের উপরেই সেবারকার মতো থাকে। তা, প্রায় সবারই বাড়ি একটা করে অধিবেশন হয়ে গেছে, শেষবার আমাদের এক ইয়ং বিলেত-ফেরত বন্ধুর বাড়িতে মজলিস হবার পালা, তিনি তাঁর এক ক্লায়েন্টের বাগানবাড়ি নিলেন কলকাতার বাইরে। আমাদের নেমন্তন্ন করলেন। মজলিসে খেয়ালীদের তো যেতেই হবে, সেই বাগানবাড়িতে আমরা সবাই গেলুম। গিয়ে দেখি কোনো কিছুরই ব্যবস্থা নেই। কত দিনের বন্ধ ঘর, তারই দু-একটা ঘর খুলে দিয়েছে— ভাপসা গন্ধ, নোংরা। আমরা সব বাইরে বাগানে পুকুরপাড়ে এসে বসলুম। সেখানেই কিছু গানবাজনা পড়াশুনো হল। রাতও দেখতে দেখতে বেশ হয়ে এল, কিন্তু খাবার আর আসে না। বসে আছি তো বসেই আছি। এক-একবার না পেরে দু-একজন উঠে গিয়ে বাগানের মালীকে জিজ্ঞেস করছি, কী রে, আর কত দেরি ?

তারা বলে, 'এই হচ্ছে, হল বলে'। এই হচ্ছে হল বলে আর খাবার তৈরি হয় না কিছুতেই। মহা মুশকিল, রাত বেড়ে চলেছে, পেট সবার খিদেয় চোঁ চোঁ করছে। এই করতে করতে শেষটায় খাবার এল, ডাক পড়ল আমাদের। উঠে গেলুম ভিতরে। আমি আশা করেছিলুম বিলেত-ফেরত বন্ধু, বেশ প্যাটি-ফ্যাটি খাওয়াবে বোধ হয়। দেখি লুচি আর পাঁঠার ঝোল এই সব করেছে। তাও

যা রান্না, বোধ হয় রাস্তার মুদিখানা থেকে বামুন ধরে আনা হয়েছিল। সে যা হোক, কোনোমতে কিছু কিছু মুখে দিয়ে সবাই উঠে পড়লুম। রাত তখন প্রায় বারোটা। সেবারকার মজলিস যতদূর ডিপ্রেসিং ব্যাপার হতে হয় তাই হয়েছিল। ফিটন গাড়িতে চড়লুম, রবিকাকা বললেন, 'ছাদ খুলে দাও।' গাড়ির ছাদ খুলে দেওয়া হল। আকাশে তখন সরু চাঁদ উঠেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া ঝির ঝির করে বইছে। ফিটন চলতে লাগল, আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। রবিকাকা বললেন, না, এ একটু বেশিরকম খামখেয়ালী হয়ে যাচ্ছে, এ-রকম করে চলবে না।

সেই থেকে কমিটি সৃষ্টি হল। কমিটির উপর ভার পড়ল, তারাই সব ঠিক করে দেবে মজলিসে কী হবে না হবে। কমিটি মানেই তো ডাক্তার ডাকা। আমরাও কমিটির হাতে ভার দিয়ে আস্তে আস্তে যে যার সরে পড়লুম। এইভাবে ওটা চাপা পড়ে গেল। নইলে অনেক কাজ হয়েছিল, সে-সময়ে রবিকাকার ভালো ভালো বই বেরিয়েছিল। তার পর ভূমিকম্প, স্বদেশী হুজুগ ; আমি চলে গেলুম আর্ট স্কুলে, রবিকাকা চলে গেলেন বোলপুরে, সব যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তার অনেক কাল পরে এই লাল বাড়িতে 'বিচিত্রা'র সৃষ্টি হয়।

১০

এইবারে বড়ো বাল্মীকিপ্রতিভার গল্প শোনো। বড়ো বলছি এইজন্য, ও-রকম মহা ধুমধামে বাল্মীকিপ্রতিভা হয় নি আর। রবিকাকা তখন আমাদের দলের হেড, সাজপোশাক স্টেজ আঁকবার ভার আমাদের উপরে। ওই সেবার থেকেই ও-সব কাজ আমাদের হাতে পেলুম। তার কিছুকাল আগে একবার বাল্মীকিপ্রতিভা নাটক করে আদিব্রাহ্মসমাজের জন্য এক পত্তন টাকা তোলা হয়ে গেছে। বেশ কয়েক হাজার টাকা উঠেছিল এই নাটক করে।

তা, এবারে কর্তাদাদামশায়ের কী খেয়াল হল, লাটসাহেবের মেম লেডী ল্যান্সডাউনকে পার্টি দেবেন, হুকুম হল বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় হবে।

বড়োরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন; মেজোজ্যাঠামশায় ছিলেন, জ্যোতিকাকামশায় ছিলেন। মেজোজ্যাঠামশায় তখন থাকেন বিরজিতলার বাড়িতে। সেখানেই আমাদের রিহার্সেল হবে। তিনি নিলেন রিহার্সেলের ভার। আমাদের মহা ফুর্তি। মেজো-জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রিহার্সেল মানেই তো খাওয়ার ধুম। খাইয়েও ছিলুম তখন খুব তা তো জানোই, বিকেল হতে না হতে সবাই ছুটতুম মেজোজ্যাঠামশায়ের বাড়ি। চা ও খাবার একপেট খেয়ে তার পর রিহার্সেল শুরু হত।

রবিকাকা সেজেছেন বাল্মীকি, আমরা সব ডাকাত, অক্ষয়বাবু দস্যু-সর্দার, বিবি লক্ষ্মী, প্রতিভাদিদি সরস্বতী, অভি হাতবাঁধা বালিকা। জোর রিহার্সেল চলছে।

সেখানে একদিন একটা কাপ্তেন এসেছিল, কাবুলীদের নাচ দেখালে। সে কী জবরদস্ত শরীর তাদের; টেনিস খেললে, তা এমন মার মারলে বল একেবারে গির্জে টপকে চলে গেল। তারা নেচেছিল খোলা তলোয়ার ঘুরিয়ে কাবুল দেশের হাজারী নাচ। এই যেমন তোমাদের সাঁওতাল নাচ আর কি, সেইরকম ওটা ছিল কাবুলী নাচ।

আমাদের তো রিহার্সেল তৈরি, সময়ও হয়ে এসেছে। যত সব সাহেবসুবো, লাটসাহেবের মেম আসবে। আমরা সাজব ডাকাত। মেজোজ্যাঠামশায় বললেন, ও হবে না, খালি গায়ে ডাকাত সাজা হবে না।

কী করা যায়। আমি বললুম তা হলে ওই হাজারীদের মতো সাজ করা যাক। সবাই খুশি, বললেন, এ ঠিক হবে। ডাকো দরজী। আগে ছিল ডাকাতদের খালি গা, বুকে সরু শালুর ফেটি।

দরজী এসে আমাদের সাজ করতে লাগল, কাবুলীদের মতো গায়ে সেই রকম পাঞ্জাবি, পা অবধি কাবুলী পাজামা। আমাদের মহা উৎসাহ, ভাবছি এবারে আমরা ডাকাত সেজে দেখাব সবাইকে, ডাকাত কাকে বলে।

মহা সমারোহে স্টেজ সাজানো হল। নিতুদা নিলেন স্টেজ সাজাবার ভার। অনেক কারিকুরি করলেন তিনি স্টেজে। মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা অর্ধচন্দ্রাকারে ভরাট করলেন। সেই থেকে সেই চাতালটা রয়ে গেছে। বটগাছ তো আগেই সাবাড় হয়েছিল, যা ছিল কিছু বাকি এনে পুঁতলেন, বনজঙ্গল বানালেন সেই মাটিতে। স্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, দোতলার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা চলে গেছে স্টেজের ভিতরে। নানারকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সিন বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। পদ্মবন, শোলার পদ্মফুল, পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের মতো পাতলা গজের পর্দা পর-পর চার-পাঁচটা স্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথমটা বেশ ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাবে, পরে এক-একটা পর্দা উঠে যাবে, ও-পাশ থেকে আস্তে আস্তে আলো ফুটবে আর একটু একটু করে পদ্মবনে সরস্বতী ক্রমশ প্রকাশ পাবে।

তখন এ-রকম ইলেকট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাস বাতি, কার্বন লাইটের ব্যবস্থা হল। লাল সবুজ মখমলের পর্দা দিয়ে স্টেজ সাজানো হল। এটা সেটা কিছুই বাদ নেই। কর্তাদামশায়ের খরচ— মনের সুখে জিনিসপত্তর আনিয়ে সাজানো গোছানো গেছে।

ও দিকে আবার বিরাট পার্টি। লাটসাহেবের মেম, দেদার সাহেব-সুবো ও বড়ো বড়ো মান্যগণ্য লোক সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। নীচে স্টেজ, উপরে দোতলার ছাদে 'সাপার' হবে, কত রকমের খাবারের আয়োজন, বরফের পাহাড় হয়ে গেছে। মেজোজ্যাঠামশায়, জ্যোতিকাকা, সারদাপিসেমশায় তাঁরা সব

রইলেন অতিথিদের খাওয়া দেখাশোনার ভার নিয়ে, রবিকাকা রইলেন আমাদের নিয়ে।

অভিনয়ের দিন এল ; সব-কিছু তৈরি, নিতুদা স্টেজ ম্যানেজার, আমাদের সাজসজ্জা তৈরি, কাবুলী ইজের পরা, কোথায়ও না গা দেখা যায়, একেবারে নতুন সাজ। লম্বা জোব্বা-টোব্বা পরে রবিকাকাও তৈরি, গলায় চেনে বাঁধা শঙ্খ ঝুলছে, শৃঙ্গবাদন করে ডাকাত ডাকবেন, সব ঠিকঠাক। অতিথি-অভ্যাগতরাও এসেছেন সব। অভিনয় শুরু করবার সময় হল। আমাদের যে বুক একটু ছুরছুর না করেছে এমন নয়। রবিকাকাও যেমন একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন এ-সব ব্যাপারে, আমাকে বললেন, দেখো তো কেমন লোকজন হয়েছে বাইরে।

আমি তো কাঁচুমাচু করছি, কী দরকার দেখবার, হয়তো ঘাবড়ে যাব।

রবিকাকা বলছেন, আঃ, দেখোই-না পর্দাটা একটু ফাঁক করে, কী রকম লোকজনের ভিড় হয়েছে দেখো।

স্টেজের ভিতর থেকেই এ-সব কথা হচ্ছে আমাদের। আমি আর কী করি, পর্দাটা আস্তে আস্তে একটু ফাঁক করে দেখি কী, ওরে বাবা! টাকে টাকে সারা উঠোন ভরে গেছে যে। যত সব সাহেবদের সাদা সাদা মাথা একেবারে চকচক করছে। বুক ছুরুছুরু করতে লাগল। আমি বললুম, এ না দেখলেই ভালো হত রবিকাকা। রবিকাকাও বললেন, তাই তো।

এ দিকে সময় হয়ে গেছে, আশু চৌধুরী উইংসের এক পাশে প্রোগ্রাম হাতে দাঁড়িয়ে, পিয়ানো হারমোনিয়াম নিয়ে জ্যোতি-কাকামশায়, বিবি বসে, সিন উঠলেই বাজাতে শুরু করবেন। প্রথম সিনে ছিল সবার আগে ডাকাতের সর্দার অক্ষয়বাবু এক পাশ থেকে একটা হুংকার দিয়ে স্টেজে ঢুকবেন। পিছু পিছু দ্বিতীয় ডাকাত আমি, এই দুটি কমিক দস্যু, পরে একে-একে

অন্য ডাকাতরা ঢুকবে। সব ঠিক; ঘণ্টা বাজল, বনদেবীরা ঘুরে ঘুরে গান করে গেল।

সিন উঠল। এখন অক্ষয়বাবুর পালা, তিনি কেন জানি না, পাশ থেকে স্টেজে না ঢুকে ও-পাশ দিয়ে ঘুরে মাঝখান দিয়ে ভিতর থেকে 'রী-রে-রে' বলে হাঁক দিয়ে যেই তেড়ে বেরিয়েছেন, নিতুদা অনেক-সব দড়িদড়ার কীর্তি করেছিলেন বলেছি, এখন তারই একটা দড়িতে অক্ষয়বাবুর গলা গেল বেধে। কিছুতেই আর খোলে না, কেমন যেন আটকে গেছে। যতই মাথা-ঝাঁকানি দেন, উঁহু, দড়ি খোলে না। মহা বিপদ, আমি পিছন থেকে আস্তে আস্তে দড়িটা তুলে দিতেই অক্ষয়বাবু এক লাফে স্টেজের সামনে গিয়ে গান ধরলেন—

আঃ বেঁচেছি এখন।
শর্মা ওদিক আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে··· সটকেছি কেমন
সা—ফ্ সটকেছি কেমন।

এই গান গাইতেই, আর তার উপর অক্ষয়বাবুর গলা, চারদিক থেকে হাততালি পড়তে লাগল। প্রথম গানেই এবারে মাৎ।

তার পর বৃষ্টি হল স্টেজে, আর সঙ্গে সঙ্গে গান

ঝিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে

পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়কড় করে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি, দুটো দম্বেল ছিল, দম্বেল জানো তো? কুস্তিগিররা কুস্তি করে, লোহার ডাণ্ডার দু-পাশে বড়ো বড়ো লোহার বল, নিতুদা দোতলায় ছাদ থেকে সেই দম্বেল দুটো গড়গড় করে এ-ধার থেকে ও-ধার গড়াতে লাগলেন। সাহেব মেমরা তো মহা খুশি, হাততালির পর হাততালি পড়তে লাগল। যতদূর রিয়ালিস্টিক করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল।

এখন দস্যুরা ঢুকবে। আগেই তো বলেছি স্টেজে মাটি ভরাট করে গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। এখন, বৃষ্টিতে সব কাদা হয়ে গেছে। দাদা স্টেজে ঢুকেই তো দপাস করে পা পিছলে পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে আর উঠলেন না, ওখানেই হাত-পা একটু তুলে বেঁকিয়ে ওইভাবেই পোজ দিয়ে রইলেন। আমরাও আশেপাশে সব যে যার পোজ দিয়ে বসলুম, লুটের জিনিস ভাগ হবে। দিনুকেও সেবারে নামিয়েছিলুম। দিনু তখন ছোটো, ওর একটা পোষা ঘোড়া ছিল, রোজ ঘোড়ায় চড়ত। সেই ঘোড়ার পিঠে আমাদের লুটের মাল বোঝাই করে দিনু স্টেজে এল। আমরা সব লুটের মাল ভাগ করলুম, একজন আবার গিয়ে ঘোড়াকে একটু ঘাসটাসও খাওয়ালে। সে কী অ্যাকটিং যদি দেখতে। তার পর চলল আমাদের মদ খাওয়া, খালিশূন্য মাটির ভাঁড় থেকে মদ ঢালা-ঢালি করছি, গান হচ্ছে—

তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!

আর খালি ভাঁড় মুখের কাছে ধরে ঢক্ ঢক্ করে হাওয়া পান করছি। এই-সব করে কালীমূর্তির কাছে আমাদের নাচ। এই তখন সেই খোলা তলোয়ার ছোরা ঘুরিয়ে কাবুলীদের নাচ নেচে দিলুম আমরা। এই নাচ আমরা রিহার্সেলে কম কষ্ট করে শিখেছিলুম? মেজোজ্যাঠামশায় ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। গান গেয়ে নাচতে নাচতে হয়বান হয়ে পড়তুম তবুও থেমে যাবার জো নেই, থেমেছি কী মেজোজ্যাঠামশায় পিছন থেকে ছড়ি দিয়ে খোঁচা মারতেন। মহা মুশকিল, যে-জায়গায় খোঁচা মারতেন পিঠটা পাটা একটু রগড়ে নিয়ে আবার উদ্দাম নৃত্য জুড়ে দিতুম। আর কী গান সেই নাচের সঙ্গে বুঝে দেখো—

কালী কালী বলো রে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো,
বলো হো।

নামের জোরে সাধিব কাজ…
হাহাহা হাহাহা হাহাহা!

সবাই মিলে চেঁচিয়ে গান ধরেছি আর সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটে অর্গান প্রাণপণে টিপে বাজানো হচ্ছে, আর ওই উদ্দাম নৃত্য— খোলা আসল তলোয়ার ঘুরিয়ে। কারো যে নাক কেটে যায় নি কী ভাগ্যিস। কী হাততালি পড়তে লাগল, এন্‌কোর এন্‌কোর চার দিক থেকে। কিন্তু ওই জিনিস কি আর দু-বার হয়।

হাতবাঁধা বালিকাকে আনা হল, অভি গান গাইলে,

হা, কী দশা হল আমার!
কোথা গো মা করুণাময়ী,
অরণ্যে প্রাণ যায় গো।
মুহূর্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে—
জনমের মতো বিদায়।

সাহেবরা এ-সব তত বোঝে না, বাঙালি যাঁরা ছিলেন কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

বাল্মীকি স্টেজে ঢুকে শাঁখ ফুঁকে ডাকাতদের ডাকবেন। স্টেজে ঢুকে শাঁখ ফুঁকতে যাচ্ছেন, চোখে সোনার চশমা চকচক করছে। আমি বলি, ও রবিকাকা, চশমা, তোমার চোখে চশমা রয়েছে যে। রবিকাকা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চশমা খুলে নিলেন।

ক্রৌঞ্চমিথুন শিকার করব, এবারে আর তুলোর বক এনে বসানো হয় নি। বুদ্ধি খুলেছে, ক্রৌঞ্চমিথুন দেখানোই হল না, অদৃশ্যে রয়ে গেল। সঙ্গীদের ডেকে ডেকে বলছি।

দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি বসেছে গাছে।
আয় দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে।

সে একেবারে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগচ্ছি, বোঝো তো স্টেজে ওইটুকু হাঁটতে ক-সেকেণ্ডেরই বা কথা কিন্তু মনে হত

যেন সময় আর কাটে না। ধনুকে তীর লাগিয়ে টানাটানি করতে করতে যেই বলা

আরে, ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ,

সঙ্গে সঙ্গে সবায়ের তীর ছোঁড়া— অডিয়েন্সের মধ্যে কী খুশির ঢেউ। সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। পাঁকাটির তীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল, খালি ক্রৌঞ্চমিথুনই বধ হল না। আর আমাদের সে কী গান,

এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো,…
বাজা শিঙা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন।

বন তো কাঁপত না, আমাদের গানের চীৎকারে পাড়াসুদ্ধ লোক জমাট বাঁধত দরজার সামনে, ভাবত হল কী এদের।

আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশুপাখি সবে,

কিন্তু পাখি তখন কোথায়, আমাদের গানের এক-এক হুংকারে সাহেবদের টাক চমকে উঠত। আমরা 'হো হো হো হো' শব্দে মেতে উঠতুম।

অক্ষয়বাবুর তো ওই ভুঁড়ি, তার উপর আরো গোটা দুই বালিশ পেটের উপর চাপিয়ে ফেটি জড়িয়ে ইয়া ভুঁড়ি ব্যাগালেন। আমরা গান করতুম,

বনবাদাড় সব ঘেঁটেঘুঁটে
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেপুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে!

বলে খুব আচ্ছা করে সবাই মিলে চার দিক থেকে অক্ষয়বাবুর ভুঁড়িতে ঘুষি মারতুম। অক্ষয়বাবুও থেকে থেকে ভুঁড়িটা বাড়িয়ে দিতেন। সে যা ব্যাপার!

বাল্মীকি দল ছেড়ে চলে গেছে, ডাকাত-সর্দার অক্ষয়বাবু গান ধরলেন,

রাজা মহারাজা কে জানে,

আমিই রাজাধিরাজ।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুমি উজির’, আর-একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কোতোয়াল তুমি’, আর অডিয়েন্সের সাহেবসুবোদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ‘ওই ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ’, বলে স্টেজে এক ঘূর্ণিপাক। আমি ভাবছি, করেন কী অক্ষয়বাবু। ভাগ্যিস সাহেবরা বাংলা জানে না; তাই তারা অক্ষয়বাবুর গানের প্রতি লাইনে হাততালি দিয়ে যাচ্ছে।

দস্যু-সর্দার বসলেন রাজাধিরাজ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে, আমাদের দিকে হাত নেড়ে পা দেখিয়ে বললেন,

পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,

কর্ তোরা সব যে যার কাজ।

বললেন সুর করে,

জানিস না কেটা আমি!

আমরা বললুম,

ঢের ঢের জানি— ঢের ঢের জানি—

ভারি ফুর্তি আমাদের, দস্যু-সর্দারকে মানছি নে, উলটে আরো বকছি,

খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা।

নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে।

সে যা অভিনয়; অমন আর হয় নি, কখনো হবেও না। ডাকাতের দল সেবারে স্টেজ মাৎ করে দিয়েছিল, স্টেজে ডাকাত ঢুকলেই হল একবার,চারি দিক থেকে অডিয়েন্স উৎসাহে হাততালি দিয়ে, এন্‌কোর বলে, সে এক কাণ্ড।

অক্ষয়বাবু সেবার যা ডাকাত সেজেছিলেন, লাটসাহেবের মেম তাঁর খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, এ-রকম অ্যাক্‌টার যদি আমাদের দেশে যায় তবে খুব নাম করতে পারে। অক্ষয়বাবুর

কী দেমাক, একেবারে বুক দশ হাত ফুলে উঠল। প্রায়ই আমাদের বলতেন, লেডি ল্যান্সডাউন আমার কথা বলেছেন যে He is my man জানো তা, এ কি চালাকি নাকি।

তার উপর রবিকাকার গান, আর তাঁর তখনকার গলা, যখন গাইতেন

> এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা!
> কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা।

সব লোক একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেত।

লক্ষ্মী সেজে বিবি যখন লাল আলোতে স্টেজে ঢুকত, আহা সে যে কী সুন্দর দেখাত। সরস্বতীর বেলায় থাকত সব সাদা— সাদা সোলার পদ্মফুলের মধ্যে শুভ্র সাজে প্রতিভাদিদি যখন বীণা হাতে বসে থাকতেন প্রথমে সবাই ভেবেছিল মাটির প্রতিমা। সেও যে কী শোভা কী বলব তোমাকে। অস্ট্রিচের ডিমের খোলা দিয়ে শখ করে একটি ছোটো সেতার বানিয়েছিলুম, সেটা রুপোলি রাংতা দিয়ে মুড়ে বীণা তৈরি হয়েছিল। আমার সেই সেতারটি ওই করে করেই গেল। তা সেই বীণাটি হাতে নিয়ে প্রতিভাদিদি বসে থাকতেন, শেষটায় উঠে রবিকাকার হাতে বীণা দিয়ে বলতেন,

> এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার—
> যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

সে কথা সত্যি সত্যিই ফলল ওঁর জীবনে।

১১

'ভগ্নহৃদয়' লেখা চুকিয়ে রবিকাকা সেই সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। জ্যোতিকাকামশায় থাকেন তখন ফরাশডাঙার বাগানে। আমরা থাকি চাঁপদানির বাগানে। এই দুই বাগান আমাদের দুই পরিবারের। আমরা তখন ছোটো ছোটো ছেলে।

এক-একদিন বেড়াতে যেতুম ফরাশডাঙার বাগানে যেমন ছেলেরা যায় বুড়োদের সঙ্গে। সেই একদিনের কথা বলছি।

তখন মাসটা কী মনে পড়ছে না, খুব সম্ভব বৈশাখ। আমের সময়। বসে আছি বাগানে। খুব আম-টাম খাওয়া হল। রীতিমত পেটের সেবা করে তার পর গান। জ্যোতিকাকামশায় বললেন, 'রবি, গান গাও।' গান হলেই রবির গান হবে। আমি তখন সাত-আট বছরের ছেলে। রবিকাকার দশ বছরের ছোটো। ওঁর তখন সতেরো বছর। সেই গানটা হল—

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

গঙ্গার ধারে, জ্যোতিকাকামশায় হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন, প্রথম সেই গান শুনলুম, সে-সুর এখনো কানে লেগে রয়েছে। কী চমৎকার লাগল। গান হতে হতে সন্ধে হল, মেঘ উঠল। গঙ্গার উপর কোন্নগরী মেঘ। নতুনকাকীমা বললেন, 'আর না, এবারে ছেলেদের নিয়ে রওনা দাও।'

ঘোড়ার গাড়িতে আসতে আসতে কী ঝড়, কী বৃষ্টি। 'চেরেট' গাড়ি, নতুন রকমের। আমরা কটি ছেলে, বাবামশায় আর বড়োপিসেমশায়। গাড়িটা ছিল কতকটা টঙ্গা গোছের। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মড়মড় করে একটা ডাল ভেঙে পড়ল গাড়ির সামনে। ওটা গাড়ির উপর পড়লে রবিকাকার গান শোনা সেই প্রথম এবং শেষ হত আর আমারও গল্প বলা ওইখানেই থেমে যেত। বাল্যকালে যখন সুরবোধ হয় নি, তখন সেই গান শুনে ভালো লেগেছিল। 'ভরা বাদর' গাইবার সঙ্গে সঙ্গে সুরের বর্ষার সঙ্গে সত্যিকার বর্ষা নামল।

সেদিন আর ফিরবে না। তার পর গানের পর গান শুনেছি, সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত ওঁর কত গানই শুনেছি। যৌবনের পাখি চলে গেছে, আর-এক পাখি এসেছে। তিনি

লিখেছেন— আমি চলে যাব, নতুন পাখি আসবে। কিন্তু নতুন পাখি আর আসবে না! একলা মানুষের কণ্ঠে হাজার পাখির গান। আমার এখনো মনে হয় তাঁর সব রচনার মধ্যে— লেখাই বলো, ছবিই বলো— সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে তাঁর গানের দান।

কথার সঙ্গে সুর রবিকাকার মতো কেউ মেলাতে পারে নি। ব্রহ্মসংগীতের সবগুলো সুর ওঁর নিজস্ব সুর নয়। 'মায়ার খেলা'র মতো অপেরা আর হয় নি। আমি সেদিন রথীকে বলেছিলুম, 'মায়ার খেলা কর-না আর-একবার।' রথী বললে, 'লোকে বলে ওতে কেবলই 'লভ'।' আমি বললুম, 'ও-রকম লোক তোমাদের দলে যদি কেউ থাকে তাকে বিদেয় করে দিয়ো।' 'মায়ার খেলা'য় তিনি প্রথম সুরকে পেলেন, কথাকেও পেলেন। বোধ হয় 'সখিসমিতি'র সাহায্যার্থে ওটি রচিত হয়, ওতে তাঁর নিজের কথার সঙ্গে সুরের পরিণয় অদ্ভুত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওখানে একেবারে ওঁর নিজস্ব সুর। অপেরা-জগতে ওটি একটি অমূল্য জিনিস। কিন্তু হায়, যে ও-সব গান গাইবে সে মরে গেছে। সেই পাখির মতো আমাদের ছোটো বোনটি চলে গেছে। এখনো 'মায়ার খেলা'র গান যদি কাউকে গাইতে শুনি, তার গলা ছাপিয়ে কতদূর থেকে আমাদের সেই বোনটির গান যেন শুনি।

সে-সুরে যে পাখি গাইত সে পাখি মরে গেছে। কে গাইবে। অভির গলায় ওই সুর যা বসেছিল! তার গলার timbre অদ্ভুত ছিল। প্রতিভাদিদিও গেয়েছেন, কিন্তু ও-রকম নয়। গান শুনে তবে মায়ার খেলা বুঝতে হয়।

ওঁর গান শুনলে এখনো আমার মনে যে কী ভাবের উদয় হয় তা ওঁরই একটি গানের একটি ছত্রে বলছি·

পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে।

সেই খামখেয়ালীর যুগে রবিকাকাকে দেখেছি, তাঁর তখন কবিত্বের ঐশ্বর্য ফুটে বের হচ্ছে। চার দিকে নাম ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়িতেও ছিলেন তিনি সবার আদরের। বাবামশায় যখন সভায় মজলিশে 'রবির একটা গান হোক' বলতেন সে যে কী স্নেহের সুর ঝরে পড়ত। তখন রবিকাকার গাইবার গলা কী ছিল, চার দিক গমগম করত। বাড়িতে কিছু-একটা হলেই তখন 'রবির গান' নইলে চলত না। আমরা ছিলুম সব রবিকাকার অ্যাডমায়ারার। জ্যোৎস্নারাতে ছাদে বসে রবিকাকার গান হত। সে-সব দিন গেছে। কিন্তু ছবি চোখের উপর ভাসে, স্পষ্ট দেখতে পাই, এখনো সে-সব গানের সুর কানে লেগে আছে যেন। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি বাবামশায়ের আমলে বাড়িতে তখন 'বিদ্বজ্জনসমাগম' বলে একটা সভা বসত। তাতে জ্ঞানীগুণীরা আসতেন, সভার নাম দেখেই বুঝতে পারছ। প্রতিভাদিদির ওস্তাদী গান হত। আমরা ফুল লতা দিয়ে দোতালার হল্‌-ঘর সাজাতুম। সেইখানেই সভা হত। বাবামশায় তখন আমাদের উপর ওই-সব ছোটোখাটো কাজের ভার দিতেন। সভার নাম আমাদের মুখে ভালো করে আসত না, আমরা নাম দিয়েছিলুম 'বিদ্যুতজন সমাগম' সভা। রঘুনন্দন ঠাকুর একবার প্রতিভাদিদিকে তানপুরো বকশিশ দিয়েছিলেন।

এখনো মনে আছে সভায় বাবা বলতেন, জ্যোতি, তুমি তোমার হারমোনিয়াম বাজাও, রবি, তোমার সেই গানটা করো— 'বলি ও আমার গোলাপবালা'। ওই গানটি তখন সবার খুব পছন্দ ছিল। থেকে থেকে হুকুম হত, 'গোলাপবালা'র গানটা হোক।

কিন্তু বক্তা ঈশ্বরবাবু, তিনি একেবারে রবিকাকার উল্টো। তিনি বলতেন, কী কবিতা লেখে রবিবাবু, চল, চল, বল, বল, ও কি কবিতা। আর একে কী গান বলে, 'বলি ও আমার গোলাপবালা'।

হ্যাঁ, গলা হচ্ছে সোমবাবুর যেমনি গলা তেমনি গান গায় বটে। রবিবাবু আবার কী গান গায়।

ঈশ্বরবাবুকে আর আমরা বাগ মানাতে পারি নে। মুড়ো গোপাল মস্ত ওস্তাদ, তিনিও শেষটায় স্বীকার করেছিলেন রবিকাকার গানে কিছু আছে। কিন্তু ঈশ্বরবাবুকে আর পেরে উঠছি না। তখন আমরা ছিলুম রবিকাকার গানের কবিতার পরম ভক্ত; কেউ কিছু সমালোচনা করলে কোমর বেঁধে লাগতুম, তাদের বুঝিয়ে ঘাড় কাত করিয়ে তবে ছাড়তুম।

তখন বঙ্গবাসী সঞ্জীবনী কাগজ বের হত। ঈশ্বরবাবু বঙ্গবাসী দেখতে পারতেন না; বলতেন, বঙ্গবাসী আবার একটা কাগজ, ইংলিশম্যান পড়ো। ইংলিশম্যান কাগজ দ্বারকানাথের আমলের, আগের নাম ছিল হরকরা, তিনিই বের করে গেছেন।

তখন সেই বঙ্গবাসীতে শশধর তর্কচূড়ামণি, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ ও চন্দ্রনাথ বসু এই তিনজন লোক রবিকাকার কবিতা গল্প নিয়ে খুব লেখালেখি করতেন, তক্কাতক্কি হত। তখনকার কাগজগুলিই ছিল ওইরকম সব খোঁচাখুঁচিতে ভরা। রবিকাকা ওঁরা তখন একটা কাগজ বের করেন যাতে কোনোরকম গালাগালি ঝগড়াঝাঁটি থাকবে না। থাকবে শুধু ভালো কথা, কাগজের নাম বড়োজ্যাঠামশায় দিলেন 'হিতবাদী'। সেই সময়েই 'সাধনা'য় বের হল রবিকাকার 'হিং টিং ছট্' নামে কবিতাটি।

আমরা ঈশ্বরবাবুকে গিয়ে বললুম, দেখো তো এই কবিতাটি কেমন হয়েছে, একবার পড়ে দেখো, একে কবিতা বলে কি না। এই বলে আমরাই তাঁকে কবিতাটি পড়ে শোনাই। সেই কবিতাটি শুনে ঈশ্বরবাবু ভারি খুশি; বললেন, এটা লিখেছে ভালো হে, এতদিনে হয়েছে ছোকরার, হ্যাঁ একেই বলে লেখা।

এইবার ঈশ্বরবাবুও পথে এলেন।

তা রবিকাকার লেখা দেশের লোক অনেকেই অনেককাল

অবধি বুঝত না, উল্টে গালাগালি দিয়েছে। সেদিনও যখন আমি অসুখের পর স্টীমারে বেড়াই, তখন তো আমি বেশ বড়োই, এক ভদ্রলোক বললেন, রবিবাবু যে কী লেখেন কিছু বোঝেন মশায়? রবিকাকা বিলেত থেকে আসার পর দেখি তেমন আর কেউ উচ্চবাচ্য করে না। হয় কী, বড়ো একটা গাছের উপর হিংসে, সেটা হয়। বন্ধুভাগ্য যেমন ওঁর বেশি, অবন্ধুও কম নয়।

তা, সেই খামখেয়ালীর সময় দেখেছি, কী প্রোডাকশন ওঁর লেখার, আর কী প্রচণ্ড শক্তি। নদীর যেমন নানা দিকে ধারা চলে যায়, তাঁর ছিল তেমনি। আমাদের মতো একটা জিনিস নিয়ে, ছবি হচ্ছে তো ছবি নিয়েই বসে থাকেন নি। একসঙ্গে সব ধারা চলত। কংগ্রেস হচ্ছে, গানবাজনা চলেছে, নাচও দেখছেন, সামান্য আমোদ-আহ্লাদ-আনন্দও আছে, আর্টেরও চর্চা করতেন তখন। ওই সময়ে আমাকে মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনী ও রবিবর্মার ফোটোগ্রাফের অ্যালবাম দিয়েছিলেন।

খেয়াল গেল ছোটোদের স্কুল করতে হবে। নীচের তলায় ক্লাস-ঘর সাজানো হল বেঞ্চি দিয়ে, ঝগড়ু চাকর ঝাড়পোঁছ করছে, ঘণ্টা জোগাড় হল, ক্লাস বসবে। কোত্থেকে মাস্টার ধরে আনলেন। কোথায় কী পাওয়া যাবে, রবিকাকা জানতেনও সব। হাল্কাভাবে কিছু হবার জো নেই, যেটি ধরছেন নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন করা চাই। ছেলেদের উপযোগী বই লিখলেন, আমাকে দিয়েও লেখালেন। ওই সময়েই 'ক্ষীরের পুতুল' 'শকুন্তলা' ওই-সব বইগুলি লিখি। নানা জায়গা থেকে বাল্যগ্রন্থ আনালেন।

প্রকাণ্ড ইন্‌টেলেক্‌ট, অমন আমি দেখি নি আর। বটগাছ যেমন নানা ডালপালা ফুলফল নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে রবিকাকাও তেমনি বিচিত্র দিকে ফুটে উঠলেন। যেটা ধরছেন এমন-কি ছোটোখাটো গল্প, তাতেও কথা কইবার জো নেই, সব-কিছু এক-একটি সম্পদ। লোকে বলে এক্সপিরিয়েন্স নেই, কল্পনা

থেকে লিখে গেছেন, তা একেবারেই নয়। লোকে খামখেয়ালীর যুগে থাকলে বুঝতে পারত।

মাথায় এল ন্যাশনাল কলেজ কী করে করা যাবে। তারক পালিত দিলেন লক্ষ টাকা, স্বদেশী যুগের টাকাও ছিল কিছু, তাই দিয়ে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট নামে কলেজ খোলা হল। তাতে তাঁত চলবে, দেশলাইয়ের কারখানা আরো সব-কিছু থাকবে।

কলেজ চলছে, মাঝে মাঝে কমিটির মিটিং বসে।

এখন, এক কমিটি বসল বউবাজারের ওখানে একটি বাড়িতে। রবিকাকা গেছেন, আমরাও গেছি, ভোট দিতে হবে তো মিটিঙে। সার্ গুরুদাস বাঁড়ুজ্জে সভার প্রেসিডেন্ট, ইচ্ছে করেই ওঁকে করা হয়েছে, তা হলে ঝগড়াঝাঁটি হবে না নিজেদের মধ্যে। কোনো প্রস্তাব হলে উনি দু-পক্ষকেই ঠাণ্ডা রাখছেন। রবিকাকা সেই মিটিঙে প্রস্তাব করলেন এমন করে কলেজের কাজ চলবে না। প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিঙের দরকার। ছ-সাতটি ছেলেকে খরচ দিয়ে বিদেশে জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে সব শিখিয়ে তৈরি করে আনা হোক।

খুবই ভালো প্রস্তাব। প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিঙের খুবই প্রয়োজন, নয় তো চলছে না। সে মিটিঙে আর-এক জন পাল্টা প্রস্তাব করলেন, তিনি এখন নামজাদা প্রফেসার, 'তার দরকার কী মশায়। বই আনান, বই পড়ে ঠিক করে নেব।'

শেষে সেই প্রস্তাবই রইল। আমরা সব অবাক। রবিকাকা চুপ। এই রকম সব ব্যাপার ছিল তখন। রবিকাকার স্কীমের ওই দশা হত। বাধা পেয়েছেন অনেক, অন্যায় ভাবে। সেই সময় থেকেই বোধ হয় ওঁর মনে মনে ছিল যে নিজেদের একটা-কিছু না করলে হবে না। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে রবিকাকা নিজের মনের মতো ফ্রি স্কোপ পেলেন। জমিজমা পুরীর বাড়ি

এমন-কি কাকীমার গায়ের গয়না বিক্রি করে শান্তিনিকেতনে সব ঢেলে দিয়ে কাজ শুরু করলেন।

১৩

বিরজিতলায় মেজোজ্যাঠামশায়ের বাড়িতে 'মায়ার খেলা' অভিনয় হয়। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র পরে এই 'মায়ার খেলা', যা দেখে মন নাড়া দিয়েছিল।

'রাজা' অভিনয় প্রথম বোধ হয় এই বাড়ির উঠোনেই হয়। আমরা তাতে কী সেজেছিলুম মনে পড়ছে না। স্টেজ ডেকোরেশন আমরাই করেছি।

একবার 'শারদোৎসবে' প্রম্প্‌টারকে স্টেজে নামিয়েছিলুম, তা জানো না বুঝি? এক অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল। রবিকাকা আমরা সবাই আছি। দেখি থেকে থেকে আমরা পার্ট্‌ ভুলে যাচ্ছি। ভয় হয় রবিকাকা কখন ধমকে টমকে বসবেন। রবিকাকাও দেখি মাঝে মাঝে আটকে যান। পার্ট্‌ আর মুখস্থ হয় না।

রবিকাকাকে বললুম, বয়স হয়ে গেছে পার্ট্‌ মনে রাখতে পারি নে, প্রম্প্‌টার পাশ থেকে কী বলে শুনতেও পাই নে সব সময়। শেষে স্টেজে নেমে বিপদে পড়ব, প্রম্প্‌টারকে স্টেজে নামানো যায় না?

রবিকাকা বললেন, সে কী কথা! আমি বললুম, দেখোই-না, বেশ মজাই হবে।

প্রম্প্‌টারদের বললুম, মশায়, স্টেজে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে। তারাও বললে, সে কী মশায়! আমি বললুম, আমি সব ঠিক করে সাজিয়ে গুজিয়ে দেব, ঠিক মানিয়ে যাবে। ভয় নেই কিছু। নয়তো শেষে পার্ট্‌ ভুলে রবিকাকার তাড়া খেয়ে এই বয়সে একটা সিন করি আর কী। তা হবে না, তোমাদেরও নামতে হবে।

দুইজন প্রম্প্‌টার নামবে। তাদের করলুম কী, বেশ নীলচিটে কালচিটে পাতলা কাপড়ের বোরখার মতো গেলাপ পরিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দিলুম ঢেকে। চোখের আর মুখের জায়গাটা একটু ফাঁক রাখলুম অবিশ্যি। হাতে দিলুম বড়ো একটা বাঁশের ডাণ্ডা। সোনালি রুপোলি কাগজ দিয়ে চক্কোর মতো লাগিয়ে দিলুম সেই ডাণ্ডাতে। যেমন মিউজিক স্ট্যাণ্ড হয় সেই রকম—যেন জীবন্ত মিউজিক স্ট্যাণ্ড বাইরে থেকে দেখতে হল। ভিতর দিকে রইল বইয়ের পাতা সুতো দিয়ে আটকানো।

এখন, এই ডাণ্ডা হাতে নিয়ে দুইজন প্রম্প্‌টার দু-পাশ থেকে স্টেজের অ্যাক্‌টারদের পিছনে ঘুরে ঘুরে প্রম্প্‌ট করে দিতে লাগল। আমাদের বড়ো সুবিধা হয়ে গেল, আর ভুল নেই, অভিনয় চলল।

বেশ হয়েছিল তাদের দেখতে, অনেকটা ব্যাকগ্রাউণ্ডের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, অল্প অল্প দেখাও যাচ্ছে পাতলা কাপড়ের ভিতর দিয়ে, কালো দৈত্যদানবের মতো পিছনে ঘোরাঘুরি করছে আর স্টেজও বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। কী একটা অভিনয় ছিল ঠিক মনে পড়ছে না। রথী বা নন্দলালকে জিজ্ঞেস কোরো, বলে দিতে পারবে।

এখন, অভিনয় তো হল, আমাদের আর কোনো অসুবিধা নেই, থেকে থেকে কখনো আমরা প্রম্প্‌টারের কাছে যাচ্ছি, তারাও থেকে থেকে আমাদের পিছনে এসে পার্ট্‌ বলে দিয়ে যাচ্ছে। রবিকাকাও দেখি মাঝে মাঝে ঘাড় কাত করে মাথা হেলিয়ে শুনে নিচ্ছেন আর অভিনয় করছেন। অভিনয়ের পরে জানাশোনার মধ্যে যাঁরা অভিনয় দেখেছিলেন তাঁদের জিজ্ঞেস করলুম, কেমন লাগল।

তারা বললে, অতি চমৎকার, আর ও-দুটো কালো কালো দৈত্যদানবের মতো পিছনে পিছনে ঘুরছিল, ও কী মশায়।

আমি বললুম, প্রম্প্‌টার। কিছু শুনতে পেয়েছিলেন কি।

তাঁরা বললেন, কিছু না কিছু না, অতি রহস্যজনক ব্যাপার ছুটো মূর্তি, আমরা আরো ভাবছিলাম পিছনে দৈত্য দানব আর সামনে আপনারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁরা অনেকে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছিলেন। বেড়ে হয়েছিল সেবারে ওই প্রম্প্‌টারদের ব্যাপার। প্রম্প্‌টাররা বললে, বেড়ে তো হল আপনাদের, আর আমরা থলের ভিতর ঘেমে ঘেমে সারা।

'ফাল্গুনী' জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই হয়, তাতে আমি, দাদারা সবাই পার্ট্‌ নিয়েছিলুম। শান্তিনিকেতনের ছোটো ছোটো ছেলেরাও ছিল। স্টেজ সাজিয়েছিলুম দোলাটোলা বেঁধে। বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের জন্য টাকা তুলতে হবে, যত কম খরচ হয় তারই চেষ্টা। ব্যাকগ্রাউণ্ডে দেওয়া হল সেই বাল্মীকি-প্রতিভার নীল রঙের মখমলের বনাত, দেখতে হল যেন গাঢ় নীল রঙের রাতের আকাশ পিছনে দেখা যাচ্ছে। বটগাছ তো আগেই সাবাড় হয়ে গিয়েছিল, বাদামগাছের ডালপালা এনে কিছু-কিছু এখানে-ওখানে দিয়ে স্টেজ সাজানো হল। সেই বাদামগাছও এই এবারে কাটা পড়ল। বাঁশের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলা টানিয়ে দিলুম। উপরে একটু ডালপাতা দেখা যাচ্ছে, মনে হতে লাগল যেন উঁচু গাছের ডালের সঙ্গে দোলা টানানো হয়েছে। তখন নন্দলালদের হাতেও একটু একটু স্টেজ সাজাবার ভার ছেড়ে দিই, জায়গায় জায়গায় বাৎলে দিই কোথায় কী দিতে হবে আর শেষ টাচটা দিই আমি নিজের হাতে। ওই শেষ টাচ ঝেড়ে দিতেই আর-এক রূপ খুলে যেত। সেই গল্পই একটা বলি শোনো। এই স্টেজ সাজানো এ কি আর দু-দিনের কথা। কবে থেকে কত এক্স্‌পেরিমেণ্ট করে তবে আজকের এই দাঁড়িয়েছে।

একবার 'শারদোৎসবে' তো ওই রকম করে স্টেজ সাজানো হল, পিছনে দেওয়া হল নীল বনাতটি, তখন থেকে ওই নীল

বনাতই টানিয়ে দেওয়া হত স্টেজের ব্যাকগ্রাউণ্ডে। প্রকাণ্ড একটা শোলার ছত্র ছিল বেশ ঝিক্‌ঝিকে আসামের অভ্র দেওয়া। সেইটিই এক পাশে টানিয়ে দেওয়ালুম। বেশ নীল রঙের আকাশের গায়ে ছত্রের রঙটি চমৎকার দেখাতে লাগল। রবিকাকার তেমন পছন্দ হল না; বললেন, রাজছত্র কেন আবার। বেশ পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে স্টেজ থাকবে। বলে সেটিকে খুলে দিলেন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। একদিন ড্রেস রিহার্সেল হবে, কোন্‌ সিনে কোন্‌ লাইট হবে, কোন্‌ লাইট আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে, কোন্‌ লাইট আবার ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে রথী আর কনক সব লিখে নিলে। সেবারে অভিনয়ে লাইটের উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছিল। এখন, সেই ড্রেস রিহার্সেল হবে, মনটা তো আমার খারাপ হয়ে আছে, শখ করে রাজছত্র টানালুম সেটা পছন্দ হল না কারো। বসে বসে ভাবছি।

নন্দলালকে বললুম, নন্দলাল, নীল রঙের বনাতের উপরে চাঁদ দিতে হবে।

নন্দলাল বললে, তা হলে চাঁদ এঁকে দেব কাপড়ের উপ্‌রে?

আমি বললুম, না, চাঁদ আঁকবে কী। সত্যিকার চাঁদ চাই। শরৎকালের আকাশ তাতে প্রতিপদের চাঁদ চাই আমার।

নন্দলাল আর ভেবে পায় না।

আমি বললুম, যাও মালীর দোকান থেকে রুপোলি কাগজ নিয়ে এসো।

নন্দলাল তখুনি দু-সিট রুপোলি কাগজ নিয়ে এল।

বললুম, কাটো, বেশ বড়ো করে একটি প্রতিপদের চাঁদ কাঁচি দিয়ে কাটো, আর গুটি দুই-তিন তারা।

নন্দলাল বেশ বড়ো করে চাঁদ ও গুটি দুই-তিন তারা রুপোলি কাগজের সিট থেকে কেটে নিয়ে এল।

আমি বললুম, যাও বেশ ভালো করে আঠা লাগিয়ে আকাশের গায়ে সেঁটে দাও। ভালো করে দিয়ো, শেষে যে আধখানা চাঁদ ঝুলে পড়বে আকাশের গা থেকে তা যেন না হয়।

নন্দলালকে পাঠিয়ে মন সুস্থির হল না। নিজেই গেলুম দেখতে ঠিকমত লাগানো হয় কি না।

নন্দলালকে বললুম, এখন কাউকে কিছু বোলো না। আজ রাত্তিরে যখন ড্রেস রিহার্সেল হবে তখন সবাই দেখবে।

তার পর স্টেজেতে নীল পর্দার উপরে যখন লাইট পড়ল, যেন সত্যিকার আকাশটি। সবাই একেবারে মুগ্ধ।

নন্দলালকে বললুম, নন্দলাল, দেখে নাও।

কী চমৎকার দেখাচ্ছিল। শেষ টাচ, এক চাঁদ আর গুটি দুই ঝক্‌ঝকা। সেই চাঁদ ডাকঘরেও আছে, ফোটোতে দেখতে পাবে।

সেইবার ফাল্গুনীতে আমি সেজেছিলুম শ্রুতিভূষণ। শান্তিনিকেতন থেকে ছোটো ছোটো ছেলেরাও এসেছিল বলেছি। ওখান থেকে গানটান কোনোরকম তৈরি করে আনা হত, আসল রিহার্সেল এখানেই হত আমাদের নিয়ে। খুব জমে উঠেছে রিহার্সেল। মণি গুপ্তও ছিল এখানে দলের মধ্যে। দেখি ওর কোনো পার্ট্‌ নেই।

বললুম, তুইও নেমে পড়্‌ অভিনয়ে—

কী পার্ট দেওয়া যায়।

বললুম, আমার চেলা সেজে ঢুকে পড়্‌। বলে তাকেও নামিয়ে দিলুম। সে আমার পুঁথিটুথি নস্যির ডিবে আসন এই-সব নিয়ে ঢুকে পড়ল। ছোট্ট ছেলেটি, গোলগাল মুখখানা, লাল চেলি পরিয়ে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে নন্দলাল সাজিয়ে দিয়েছিল। বেশ দেখাচ্ছিল।

আমি পরেছিলুম শুঁড়তোলা চটি, গায়ে নামাবলী, যেমন

পণ্ডিতদের সাজ, গরদের ধুতি, তা আবার কোমর থেকে ফস্‌-ফস্‌ করে খুলে যায়। নন্দলালকে বললুম লম্বা একটা দড়ি দিয়ে কোমরে ধুতিটা ভালো করে বেঁধে দাও, দেখো যেন খুলে না যায় আবার স্টেজের মাঝখানে। কাপড়ের ভাবনাই ভাবব, না অভিনয়ের কথা ভাবব। আচ্ছা করে কোমরে লম্বা দড়ি তো জড়িয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে নিলুম। মণীন্দ্রভূষণ থেকে থেকে নস্যির ডিবেটা এগিয়ে দিত— আচ্ছা করে নস্যি নাকে দিয়ে সে যা অভিনয় করেছিলুম।

রবিকাকা সেজেছিলেন অন্ধ বাউল। পিয়ার্সনকেও সেবার সেনাপতি সাজিয়ে নামানো হয়েছিল। তখন এক মেমসাহেব শান্তিনিকেতনে কিছু কাল ছোটোদের পড়াতেন, প্যালেস্টাইন না কোথা থেকে এসেছিলেন। রবিকাকাকে বললুম, তাঁকেও নামিয়ে দাও। অভিনয়ে সাহেব আছে তার একটা মেমসাহেবও থাকবে, বেশ হবে।

রবিকাকা বললেন, ও কী করবে।

আমি বললুম, কিছু করবার দরকার কী, মাঝে মাঝে স্টেজে এসে অন্য অনেকের মতো ঘোরাফেরা করে যাবে। রবিকাকাকে বলে তাকেও নামিয়ে নিলুম। প্রতিমারা মেমসাহেবকে সাজিয়ে দিলে। আমি বললুম, বেশি কিছু বদলাতে হবে না, ওদের দেশে যেমন মাথায় রুমাল বাঁধে সেই রকমই বেঁধে একটু-আধটু সাজ বদলে দিলেই হবে।

অভিনয় খুব জমে উঠেছে। আমি শ্রুতিভূষণ সেজে বাঁকা সাপের মতো লাঠি হাতে, তোমার দাদা মুকুলেরই দেওয়া সেটি, লাঠির মুখটা কেটে আবার সাপের মতো করে নিয়েছিলুম, সেই লাঠি হাতে ছেলেছোকরাদের ধমকাচ্ছি।

‘ওগো দখিন হাওয়া’ গানের সঙ্গে ছেলেরা খুব দোলনায় দুলছে। কেউ আবার উঠতে পারে না দোলনাতে, নেহাত ছোট্টো,

তাকে ধরে দোলনাতে বসিয়ে দিই। খুব নাচ গান দোল এই-সব চলছে।

শেষ গান হল 'সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'। সেই গানে নানা রঙের আলোতে সকলের একসঙ্গে হুল্লোড় নাচ। আমি ছোটো ছোটো ছেলেগুলোকে কোলে নিয়ে পুঁথিপত্র নস্যির ডিবে হাতে, নামাবলী ঘুরিয়ে নাচতে লাগলুম। মেমসাহেবও নাচছে। রবিকাকার ভয়ে সে বেচারী দেখি স্টেজের সামনে আসছে না, সবার পিছনে পিছনে থাকছে। আমি তার কাছে গিয়ে এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে স্টেজের সামনে এনে তিন পাক ঘুরিয়ে দিলুম ছেড়ে, মেমসাহেবের কোমর ধরে বল্ নাচ নেচে। অডিয়েন্সের হো হো শব্দের মধ্যে ড্রপসিন পড়ল।

ডাকঘর অভিনয় হবে, স্টেজে দরমার বেড়ার উপর নন্দলাল খুব করে আলপনা আঁকলে। একখানা খড়ের চালাঘর বানানো হল। তক্তায় লাল রঙ, ঘরে কুলুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা, ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার যেন একটি পাড়াগেঁয়ে ঘর। সব তো হল। আমি দেখছি, নন্দলালই সব করলে। সেই নীল পর্দার চাঁদ ডাকঘরেও এল। মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি বলি বেশ হয়েছে। নন্দলালের সাধ্যমত তো স্টেজকে পাড়াগেঁয়ে ঘর বানালে। তার পর হল আমার ফিনিশিং টাচ।

আমি একটা পিতলের পাখির দাঁড়ও এক পাশে ঝুলিয়ে দেওয়ালুম। নন্দলাল বললে, পাখি?

আমি বললুম, না, পাখি উড়ে গেছে, শুধু দাঁড়টি থাক্।

দেখি দাঁড়টি গল্পের আইডিয়ার সঙ্গে মিলে গেল। সবশেষে বললুম, এবারে এক কাজ করো তো নন্দলাল। যাও, দোকান থেকে একটি খুব রঙচঙে পট নিয়ে এসো তো দেখি। নন্দলাল পট নিয়ে এল। বললুম, এটি উইঙের গায়ে আঠা দিয়ে পট্টি মেরে দাও।

যেমন ওটা দেওয়া, একেবারে ঘরের রূপ খুলে গেল। সত্যিকার

পাড়াগেঁয়ে ঘর হল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যেন সাজানো-গোছানো। এ-সব ফিনিশিং টাচ আমার পুঁজিতে থাকত। এই রকম করে আমি নন্দলালদের শিখিয়েছি।

ডাকঘরে আমি হয়েছিলুম মোড়ল। ও-রকম মোড়ল আর কেউ সাজতে পারে নি। তখন মোড়ল সেজেছিলুম, সেই মোড়লি করেই চলেছি এখনো।

এই স্টেজ সাজানো দেখো কতভাবে হত, এই তো কয়েক রকম গেল। আর-একবার শারদোৎসবে বক উড়িয়ে দিলুম ব্যাক-গ্রাউণ্ডে। নন্দলালদের বললুম, একটা কাপড়ে খড়িমাটি প্রলেপ দিয়ে নিয়ে এসো।

ওরা কাপড়ে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে টান করে ধরল। আমি এক সার বক এঁকে দিলুম ছেড়ে। তারা ডাকতে ডাকতে স্টেজের উপর দিয়ে যেতে লাগল।

দালানের সামনে সেবার শারদোৎসব হয়।

তখন অভিনয়ে এক-একজনের সাজসজ্জাও এমন একটু অদল-বদল করে দিতুম যে, সে অন্য মানুষ হয়ে যেত। রবিকাকার দাড়ি নিয়ে কম মুশকিলে পড়েছি? শোনো সে গল্প।

এখন, রবিকাকার যত দাড়ি পাকছে সেই পাকা দাড়িকে কালো করতে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনো রকম করে তো দাড়িতে কালো রঙ লাগিয়ে অভিনয়ে কাজ সারা হত কিন্তু অভিনয়ের পরে রাত্তিরে সেই কালো রঙ ওঠানো সে এক ব্যাপার। ভেসলিন তেল মেখে সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে তার রঙ ওঠাতে হয়। আমার চুলে যে সাদা রঙ একটু-আধটু লাগিয়ে কাঁচাপাকা চুল করা হত তাই ধুয়ে পরিষ্কার করাই আমার পক্ষে অসম্ভব হত। আমি তো কালিঝুলি মাখা অবস্থায়ই এসে ঘুমিয়ে থাকতুম। কে আবার রাত্তির বেলা ওই ঝঞ্ঝাট করে। কিন্তু রবিকাকার তো তা হবার জো নেই।

সেবার 'তপতী' অভিনয় হবে— রবিকাকা সেজেছেন রাজা। সাজগোজ রবিকাকা বরাবর যতখানি পারেন নিজেই করতেন। পরে আমরা তাতে হাত লাগাতুম।

তপতীর ড্রেস রিহার্সেল হবে। সুরেন, রথী ওরা বাক্সভর্তি রঙ কালি এনেছে। রবিকাকা তা থেকে কয়েকটা কালো রঙ তুলে নিয়ে ঢুকলেন ড্রেসিং রুমে। নিজেই দাড়ি কালো করবেন।

খানিক বাদে বেরিয়ে এলেন মুখে গালে দাড়িতে কালিঝুলি মেখে। ছোটো ছেলে লিখতে গেলে যেমন হয়। আমি বললুম, রবিকাকা, এ করেছ কী।

রবিকাকা বললেন, কেন, দাড়ি বেশ কালো হয়েছে তো।

আমি বললুম, দাড়ি কালো হবে বলে কি তোমার মুখও কালো হয়ে যাবে নাকি।

এখন, রবিকাকা করেছেন কী, আচ্ছা করে গালের উপর কালো রঙ ঘষেছেন— তাতে দাড়ি কালো হয়েছে বটে, সঙ্গে সঙ্গে গালের চামড়া ও মুখের চার দিক কালো হয়ে অতি বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হল দেখতে।

আমি.বললুম, এ চলবে না— না-হয় সাদা দাড়ি থাকবে তাও ভালো, অল্প বয়সে কি লোকদের চুল পাকে না? এ রাজারও অল্প বয়সেই চুল পেকেছে— তাতে হয়েছে কী। তা বলে তোমার মুখ কালো হয়ে যাবে— ও হবে না। প্রতিমাও বললে, রোজ এই রাত্তিরে জল ঘাঁটাঘাঁটি করে শেষে বাবামশায়ের একটা অসুখ-বিসুখ করবে।

ড্রেস রিহার্সেল তো হল। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি কী করা যায়। সকালে উঠে প্রতিমাকে বললুম, তোরা মেয়েরা যে অনেক সময়ে মাথায় কালো রঙের গজের কাপড় দিস— তাই গজখানেক আনা দেখি। ওই-যে মেমসাহেবরা চুল আটকাবার জন্যে পরে। পাতলা, অনেকটা চুলেরই মতো দেখতে লাগে

দূর থেকে। সেই কাপড় তো এল— আমি অভিনয়ের আগে রবিকাকাকে বললুম, তুমি আজ আর রঙ মেখো না দাড়িতে। আমি তোমার দাড়ি কালো করে দেব। বলে, সেই কাপড় বেশ করে কেটে দাড়িতে গেলাপের মতো লাগিয়ে কানের দু-পাশে বেঁধে দিলুম। গোঁফেও ওই রকম করে খানিকটা কাপড় লাগিয়ে মুখের কাছটা কেটে দিলুম। সবাই বললে, কেমন হবে দেখতে। আমি বললুম, ভেবো না— স্টেজে আলো পড়লে এ ঠিকই দেখাবে।

সত্যি, হলও তাই, স্টেজ থেকে যা দেখাল, সবাই অবাক। বললে এ চমৎকার কালো দাড়ি হয়েছে। রবিকাকারও আর কোনো ঝঞ্ঝাট রইল না— অভিনয়ের পরে কাপড়ের গেলাপটি খুলে ফেললেই হল।

বহুকাল অবধি স্টেজ সাজাবার ও অভিনয় যারা করবে তাদের সাজিয়ে দেবার কাজ আমাদের হাতেই ছিল— এখন না-হয় তোমরা নিয়েছ সে-সব কাজ। আর-একবার কী একটা অভিনয়ে— এই তোমাদের কালেরই ব্যাপার, যাতে বাসুদেব তাণ্ডব নেচেছিল —সেই স্টেজেরই ঘটনা বলি শোনো। বাসুদেবকে দেশ থেকে আনানো হয়েছিল তাণ্ডব নাচের জন্য। তার পর কী কারণে যেন তাকে নাকচ করে দেওয়া হয়।

এখানে তো দলবল এসেছে অভিনয় হবে, স্টেজ তৈরি হল— মহাধুমধামে। স্টেজে রাজবাড়ির ফ্রণ্ট্ হবে— খিলেন-টিলেন দেওয়া, স্টেজ আর্কিটেক্ট্ সুরেন শান্তিনিকেতন থেকেই কাঠের ফ্রেম তৈরি করে আনিয়ে ফিট-আপ করেছে। এখন তাতে কাপড় লাগিয়ে রঙ দেবে। নেপালের রাজা বোধ হয় সেবার অভিনয় দেখতে এসেছিলেন।

আমি বললুম, করেছ কী। কাপড় লাগিয়েছ, ভিতর থেকে আলো দেখা যাবে যে!

কী করা যায়!

বললুম, দরমা নিয়ে এসো।

যেখান থেকে আলো দেখা যায় সেখানে দরমা লাগিয়ে দেওয়ালুম। এখন কাপড়ে রঙ করবে কী করে। একদিনে কাপড়ে মাটি লাগিয়ে রঙ দিলে শুকোবে কেন। তখন আবার বর্ষাকাল— দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে। খানিক শুকোবে খানিক শুকোবে না— সে এক বিতিগিচ্ছি ব্যাপার হবে দেখতে।

তাই তো, এখন উপায়। বললুম, স্টেজের মাপ নিয়ে যাও— বড়ো বড়ো পিস্‌বোর্ড কিনে এনে কাঠের ফ্রেমের উপর লাগিয়ে দাও। অভিনয় হবে সন্ধেতে— সকালে এই-সব কাণ্ড হচ্ছে। প্রোসিনিয়াম (Proscenium) ঠিক না হলে তো হবে না। নন্দলালকে বললুম, আজ আর এবেলা বাড়ি যাব না— এখানেই আমাকে একটু তামাক-টামাকের বন্দোবস্ত করে দাও।

দোকান থেকে পিস্‌বোর্ড এল, কাঠের ফ্রেমে লাগানো হল। বললুম, বেশ করে গোলাপি রঙ খানিকটা গুলে দাও।

বড়ো বড়ো তুলি দিয়ে সেই রঙ পিস্‌বোর্ডের উপর লাগিয়ে দিয়ে সুরেনকে বললুম, এবারে এদিক-ওদিকে কিছু লাইন কাটো। চমৎকার গোলাপি পাথরের প্রোসিনিয়াম তৈরি হয়ে গেল। আমি বললুম, বাঃ, দেখো তো এবার। কাদা দিলে তার উপরও আঁকা চলত বটে কিন্তু সাত দিনেও শুকোত না।

বাড়ি ফিরে এলুম— ওদিকে তো ওই-সব হচ্ছে— বাসুদেব দেখি মুখ শুকিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। আমি রবিকাকাকে গিয়ে বললুম, আচ্ছা বাসুদেব তো ভালোই নাচে, তবে ওকে তোমরা এবারে নাচতে দিচ্ছ না কেন।

রবিকাকা বললেন, না, ও যেন কী রকম নাচে, এদের সঙ্গে মেলে না— আর ও যা কালো, স্টেজে মানাবে না।

আমি বললুম, আচ্ছা আমার হাতে ছেড়ে দাও এক রাত্তিরের

জন্য। আশা করে এসেছে, আমি সাজিয়ে দিই— যদি ভালো না লাগে পরে নাকচ করে দিয়ো।

রবিকাকার তো মত নিয়ে এলুম। আমাদের ছেলেবেলায় সেই 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখবার দরবার মনে পড়ল। বাসুদেবকে বললুম, দরবার মঞ্জুর হয়ে গেছে, ঠিক তিনটের সময় আমাকে খবর দিয়ো— আমি তোমাকে সাজিয়ে দেব। সে তো খুব খুশি।

ইতিমধ্যে আমি খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম করে উঠতে তিনটার সময় বাসুদেব এল। বাসুদেবকে নিয়ে গেলুম যেখানে নন্দলাল সবাইকে সাজাচ্ছে। সবার সাজ তৈরি। নন্দলাল আমাকে বললে, তা হলে বাসুদেবকে একটু হলদে রঙটঙ মাখিয়ে দিই।

আমি বললুম, অমন কাজও কোরো না। ওকে সাদা রঙই দাও আর হলদে মাখাও, ভিতর থেকে নীল আভা বের হবেই। খানিক গেরিমাটি আনো। সব গায়ে মাখাবার দরকার নেই— জায়গায় জায়গায় যেখানে রুখো কালো আছে সেখানে সেখানে লাগিয়ে দাও।

নন্দলাল বাসুদেবের হাঁটুতে কনুইতে ঘাড়ে এখানে ওখানে বেশ করে গেরিমাটির গুঁড়ো ঘষে লাগিয়ে দিলে। কালো রঙের উপরে গেরি লাগাতে দিব্যি যেন একটা আভা ফুটে উঠতে লাগল। এইটুকু করে দিয়ে আমি নন্দলালকে বললুম, এবারে একটু চোখ ভুরু টেনে ওকে ছেড়ে দাও। বেশ করে মালকোঁচা ধুতি পরিয়ে মাথায় একটা পটকা, গলায় একটু গয়না এই-সব একটু-আধটু দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া গেল।

সেদিন অডিয়েন্সের খুব ভিড়, কোথায় বসি। কুতির বাড়ির সামনে নীচের তলায় একটু খিলেনমতো আছে। নন্দলাল আমার সঙ্গে। সেখানেই দুজনে কোনোমতে জায়গা করে চৌকির চেয়েও আরামে বসে রইলুম।

বাতি জ্বলল, সিন উঠল। বাসুদেব যখন স্টেজে ঢুকল— কী বলব তোমাকে— মনে হল যেন ব্রোঞ্জের মূর্তিটি। মনে ভয় ছিল বাসুদেব এবার কী করে, শেষে না রবিকাকার তাড়া খেতে হয়।

অন্য সব নাচ কানা সেদিন। বাসুদেবের নাচে সবাই আশ্চর্য হয়ে রইল— যেন ব্রোঞ্জের নটরাজ জীবন্ত হয়ে স্টেজে নেচে দিয়ে গেল। শুধু রঙ মাখালেই স্টেজে খোলতাই হয় না। রঙ মাখানোর হিসেব আছে। ভগবান-দত্ত চামড়াকে বাঁচিয়ে তবে রঙ মাখাতে হয়। এ কি সোনার উপর গিল্‌টি করা— খোদার উপর খোদকারি? যার যা রঙ তা রেখে সাজাতে হয়।

অভিনয়ের পরে রবিকাকাকে বললুম, এই বাসুদেবকে না নামালে তোমাদের প্লে জমতই না।

এখন দেখো সাজের একটু অদলবদলে জিনিসটা কতখানি তফাত হয়।

'নটীর পূজা'তে আমরা ছিলুম না। তখন ওরা সবাই পাকা হয়ে গেছে— আমরা দেখবার দলে। রবিকাকা তার কিছুকাল আগে বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। আমাকে দাদাকে ফিরে এসে আরবী জোব্বা দিলেন।

সেদিন অভিনয়ে অনেকেই আসবেন— লাটসাহেবের মেমও বুঝি আসবেন। রবিকাকা আমাদের বললেন, তোমরা ভালো করে সেজে এসো।

আমরা রবিকাকার দেওয়া সেই আরবী জোব্বা পরে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি অতিথি রিসিভ করতে।

নটীর পূজা অভিনয় হল— নন্দলালের মেয়ে গৌরী নটী সেজেছে। ও যখন নটী হয়ে নাচল সে এক অদ্ভুত নাচ। অমন আর দেখি নি। ড্রপ পড়তেই ভিতরে গেলুম। গৌরীকে বললুম, আজ যে নাচ তুই দেখালি; এই নে বকশিশ। বলে রবিকাকার দেওয়া সেই জোব্বা গা থেকে খুলে দিয়ে দিলুম। ওকে আর কিছু

বললুম না— নন্দলালকে বললুম, তোমার মেয়ে আজ আগুন স্পর্শ করেছে, ওকে সাবধানে রেখো।

তার পরে আর-একবার দেখেছিলুম যখন 'তপতী' হয়েছিল। অমিতা তপতী সেজে অগ্নিতে প্রবেশ করছে। সেও এক অদ্ভুত রূপ। প্রাণের ভিতরে গিয়ে নাড়া দেয়। আমি 'তপতী'র সমস্ত ছবি এঁকে রেখেছিলুম।

পরে যত অভিনয়ই হয়েছে আজকাল, অমন আর দেখলুম না— সে সত্যি কথাই বলব।

তাই তো একবার রবিকাকাকে বললুম, করলে কী রবিকাকা, ঘরের পিদিম নিভিয়ে ফেললে, এখন বাইরের পিদিম জ্বালিয়ে কী করবে।

রবিকাকা বললেন, তা আর কী করা যায়, চিরকালই কি আর ঘরের পিদিম জ্বলে।

১৪

দেখো মনে সব থাকে। সেই ছেলেবেলা কবে কোন্‌কালে দেখেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নীলে সাদায় নকশা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গা-ময় ফুটো, উপরে টানিয়ে রাখত। ভিতরে চোঙের মতো একটা কী ছিল তাতে খাবার দেওয়া হত। পাখিরা সেই ফুটো দিয়ে আসত, খাবার খেয়ে আর-এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেত। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষের মনও তাই। স্মৃতির প্রকাণ্ড জালা, তাতে অনেক ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে স্মৃতি ঢুকছে আর বের হচ্ছে। জালা খুলে বসে আছি, কতক বেরিয়ে গেছে কতক ঢুকছে কতক রয়ে গেছে মনের ভিতর, ঠোকরাচ্ছে তো ঠোকরাচ্ছেই, এ না হলে হয় না আবার। আর্টেরও তাই। এই ধরো-না বিশ্বভারতীর রেকর্ড, রবিকাকা কোথায় গেলেন, কী করলেন, সব লেখা আছে; কিন্তু তা আর্ট নয়, ও হচ্ছে হিসেব।

মানুষ হিসেব চায় না, চায় গল্প। হিসেবের দরকার আছে বৈকি, কিন্তু ওই একটু মিলিয়ে নেবার জন্য, তার বেশি নয়। হিসেবের খাতায় গল্পের খাতায় এইখানেই তফাত। হিসেব থাকে না মনের ভিতরে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়, থাকে গল্প। সেই 'ঘরোয়া' গল্পই বলে গেলুম তোমাকে।

গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়

অক্ষয়—অক্ষয় মজুমদার

অভি—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা অভিজ্ঞা দেবী

অমিতা—অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা, শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী

অরুদা—অরুণেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র

ঋতু—ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কনক—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্তাদাদামশায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

কর্তাদিদিমা—মহর্ষিদেবের সহধর্মিণী সারদা দেবী

কিশোরী—মহর্ষিদেবের অনুচর কিশোরী চট্টোপাধ্যায়

কৃতি—কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র

গৌরী—নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী ভঞ্জ

ছোটোদাদামশায়—নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যাঠামশায়—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিকাকামশায়—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাদা—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাদামশায়—অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ

দিনু—দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ

দীপুদা—দ্বিপেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র

দ্বিজুবাবু—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নতুন কাকীমা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী

নন্দলাল—নন্দলাল বসু

নিতুদা—নীতীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র

নির্মল—অবনীন্দ্রনাথের জামাতা নির্মল মুখোপাধ্যায়

নাটোর—নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়

পশুপতিবাবু—পশুপতি বসু

প্রতিভা দেবী—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী

প্রিয়ম্বদা—কবি প্রিয়ম্বদা দেবী
বঙ্কিমবাবু—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বড়োজ্যাঠামশায়—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বড়োপিসিমা—মহর্ষিদেবের কন্যা সৌদামিনী দেবী
বলু—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাবামশায়—গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাসুদেব—শিল্পী শ্রীবাসুদেবন
বিবি—সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা দেবী
বৈকুণ্ঠবাবু—বৈকুণ্ঠনাথ সেন
মণি গুপ্ত—শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
মহানন্দ—মহানন্দ মুন্‌শি : দ্র. জীবনস্মৃতি
মা—সৌদামিনী দেবী
মুকুল—শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে
মেজোজ্যাঠাইমা—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
মেজোজ্যাঠামশায়—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রথী—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীনাথ জ্যাঠামশায়—শ্রীনাথ ঠাকুর
সমরদা—সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সরলা—সরলা দেবী চৌধুরানী
সারদা পিসেমশায়—সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌদামিনী দেবীর স্বামী
সুনয়নী—ভগ্নী সুনয়নী দেবী
সুরেন—সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
— শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর
সোমকা, সোমবাবু—রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
হ. চ. হ.—হরিশ্চন্দ্র হালদার
হেম ভট্ট—আদি ব্রাহ্মসমাজের হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য
হ্যাভেল সাহেব—ঈ. বি. হ্যাভেল

নির্দেশিকা

শ্রীসুবিমল লাহিড়ী এই নির্দেশিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।